জাতীয় পরিমাপন ও মূল্যাঙ্কন পর্ষদ (NAAC) কর্তৃক পুনঃ স্বীকৃত
তৃতীয় সমীক্ষায় 'বি' গ্রেড প্রাপ্ত

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য কলেজ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ.জি.সি. অনুমোদিত সহ-শিক্ষামূলক ডিগ্রী কলেজ)

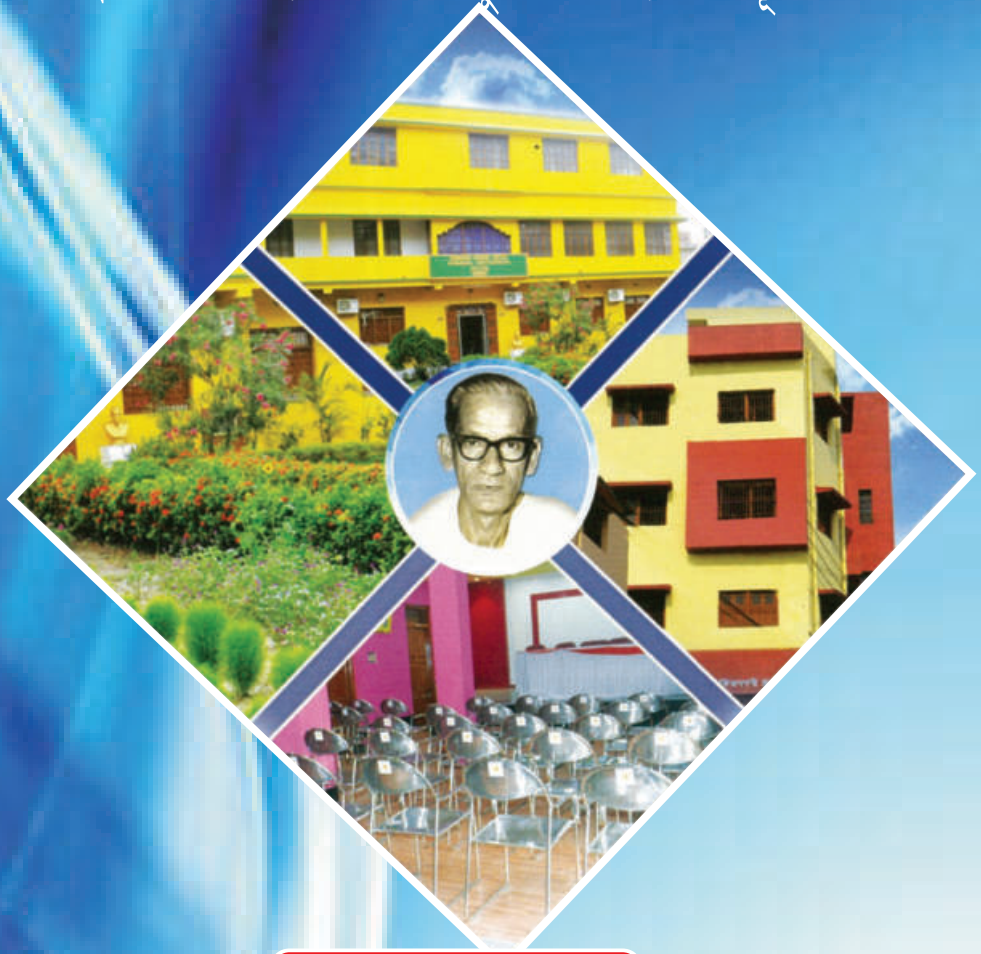

প্রতিষ্ঠা বর্ষ–১৯৮৫

'কোরক'

২০১৯–২০২০

১৫, কোনা রোড, রামরাজাতলা, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া–৭১১ ১০৪
Email : klb.college@gmail.com, Website : www.drklbcollege.ac.in

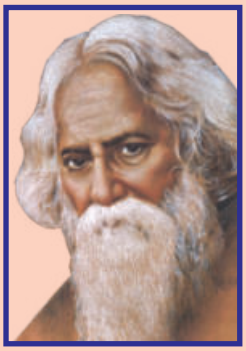

মাষ্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া-নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত জ্ঞান তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে ঃ তাহা মুখের কথা তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখ মুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা সংগীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

★ ★ ★

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

★ ★ ★

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় পরিমাপন ও মূল্যাঙ্কন পর্ষদ (NAAC) কর্তৃক পুনঃ স্বীকৃত
তৃতীয় সমীক্ষায় 'বি' গ্রেড প্রাপ্ত

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য কলেজ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ.জি.সি. অনুমোদিত সহ-শিক্ষামূলক ডিগ্রী কলেজ)

প্রতিষ্ঠা বর্ষ-১৯৮৫

'কোরক'

কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

সন-২০১৯-২০২০

১৫, কোনা রোড, রামরাজাতলা, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৭১১ ১০৪
Website : www.drklbcollege.ac.in
E-mail : klb.college@gmail.com

।। ২০১৯-২০২০ সালের পত্রিকা উপসমিতি ।।

অধ্যক্ষ – ড. কৌস্তভ লাহিড়ী

অধ্যাপক কেশবচন্দ্র খাঁড়া

অধ্যাপিকা শিপ্রা গাঙ্গুলী

অধ্যাপিকা বিদূষী হালদার (সরদার)

অধ্যাপক ড. সমীর কুমার নস্কর

অধ্যাপিকা করবী দাস

শ্রীমতী অমৃতা সরকার

অনীক দাস (ছাত্র প্রতিনিধি)

।। সূচীপত্র ।।

অধ্যক্ষের কলমে	ড. কৌস্তভ লাহিড়ী	
ছাত্র প্রতিনিধির কলমে	অনীক দাস	
সম্পাদকের কলম থেকে	অধ্যাপক কেশবচন্দ্র খাঁড়া	
শ্রদ্ধাঞ্জলি		
কবিতা ঃ		পৃষ্ঠা
ছোট ফুল	স্বর্ণালী করাতি	১
আষাঢ়ের রাত	রিয়া পাল	১
পূজোর আগমন	রিঙ্কি নস্কর	২
আগমনী	সমতা সাউ	২
বই	জবা মজুমদার	৩
একলা জীবন	জুই মজুমদার	৩
শান্তির সন্ধানে	সোনালী ভট্টাচার্য্য	৪
ফেসবুক	সোনালী ভট্টাচার্য্য	৫
কলেজ ম্যাগাজিন	বিক্রম গোস্বামী	৫
মানবিকতা	বিপাশা দাস	৬
মনের কথা	মধুমিতা গায়েন	৬
শরৎ আসে	মধুমিতা গায়েন	৭
স্মৃতির পাতায়	অদিতি সেনাপতি	৮
বিশ্বকবি	সুস্মিতা সাঁত্রা	৮
নোবেল করোনা ভাইরাস	নুপূর সাঁতরা	৯
মাতৃভাষা	দিশা কাঁড়ার	৯
মা	শুভাশীষ দেব বর্মন	১০
আমার ভারত, তোমার ভারত	পৌষালী ঘোষ	১১-১২
বন্ধু	সাধনা বাগ	১৩
বসন্ত	পায়েল সাধুখাঁ	১৩
আমার আমি, ভীষণ দামী	টুম্পা মন্ডল	১৪
দুঃসংবাদ	টুম্পা মন্ডল	১৫
ভারতমাতা কাঁদছে	শুভজিৎ সিং	১৬
ফুলের কুঁড়ি	লিসা বাগ	১৭
ছোট্টো মনে ছোট্টো স্বপ্ন	অরিন্দম সাবুই	১৮

রং বীর	শুভজিৎ কোলে	১৯
বাইরে মন	সৌরভ দাস	১৯
Success	সৌরভ দাস	২০
MACBETH	সৌরভ দাস	২০
রোদ্দুরের অপমৃত্যু	রূপক জানা	২১
তাকে খুঁজে পেয়েছ ?	স্বাগতা খাঁড়া	২২–২৩
ম্যাগাজিন	বিদিশা চক্রবর্ত্তী	২৪
মা	চিরশ্রী চ্যাটার্জী	২৪
দূষণ মুক্তি	সুপ্রিকা গাঙ্গুলী	২৫
ছবি ঃ চাঁদনি রাত	Fajrul Haque	২৬
করোনার কবিতা	অধ্যাপক কেশবচন্দ্র খাঁড়া	২৭–২৮
গল্প ঃ		
আমি বীরাঙ্গনা	ঈশিকা দে	২৯–৩০
'আমি ফিরছি'	দিশা কাঁড়ার	৩১–৩২
হঠাৎ দেখা	স্নেহা বোস	৩৩
অনাথ ছেলে	সোমনাথ দলুই	৩৪–৩৫
এই রাত	মল্লিকা রং	৩৬–৩৮
শুভ জন্মদিন	শুভময় চ্যাটার্জী	৩৯–৪০
হারানো সুর	বিদিশা চক্রবর্ত্তী	৪১
ছবি	অনুশ্রী নস্কর	৪২
প্রবন্ধ ঃ		
বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার দৃষ্টিভঙ্গি	শুভদীপ ঘোষ	৪৩–৪৪
Due to the glamour of the flim industry	তথাগত চৌধুরী	৪৫
জীবনের প্রকৃত অর্থ	সঞ্চারী রায়	৪৬–৪৭
ছবি	মধুমিতা গায়েন	৪৮
ভ্রমণ ঃ		
ঘাটশিলা ভ্রমণ	স্বর্ণালী করাতি	৪৯–৫০
একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	ফজরুল হক	৫১–৫৩
Netaji Subhas Open University	Dr. KBC College	৫৪
Commencement of Admission	Dr. KBC College	৫৫

অধ্যক্ষের কলমে

ড. কৌস্তভ লাহিড়ী

আমার কাছে এটা আনন্দের বিষয় যে, আমাদের কলেজ পত্রিকা 'কোরক' ২০১৯-২০ প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশে যেসব শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে তাদের প্রতি আমার অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

ছাত্র প্রতিনিধির কলমে

আমাদের কলেজের ২০১৯–২০২০ শিক্ষাবর্ষের সাহিত্য পত্রিকা কোরক'এর বিলম্বিত প্রকাশের সবচেয়ে বড়ো কারণ হল করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী তান্ডব। এই ভাইরাসের আক্রমণে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মতো আমরাও দিশেহারা। তথাপি সৃষ্টির ধারা অব্যাহত, থাকে তাই সকলের সহযোগিতায় আমরাও 'কোরক' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। যে সকল ছাত্র–ছাত্রী–অধ্যাপক–অধ্যাপিকা–শিক্ষাকর্মীগণের লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণের সহযোগিতার জন্যও তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। বিশেষভাবে অধ্যক্ষ মহাশয়ে সক্রিয়তায় আমরা মুগ্ধ।

জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন সহ–

অনীক দাস

সম্পাদকীয়

মহামারী শব্দটা অভিধানে পড়া, বাস্তবে তার ভয়ঙ্কর রূপ আমরা জীবদ্দশায় দেখিনি। কিন্তু ২০২০-২০২১শে তার স্বরূপ আমাদের হতচকিত নয়, স্তম্ভিত করেছে। তাকে চোখে দেখা যায় না, হাতে ধরা যায় না, আগুনে ধ্বংস করতে চাইলেও অমানুষিক হিম্মত লাগে। সারা দেশে নয় সমগ্র বিশ্ব আজ প্রায় দিশেহারা তার প্রভাবে। করোনার থাবায় কত শিশু অনাথ হয়েছে। কেউ হারিয়েছে মাকে, কেউ পিতাকে। কত মানুষের আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। যে সকল করোনা যোদ্ধা সামনের সারিতে থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। লড়াই করতে করতে যার প্রান দিয়েছেন তাঁদের আত্মীয়জনদের প্রতি সহমর্মিতা।

তবু সূর্য ওঠে-অস্ত যায়। ঋতুর আবর্তন হয়-ফুল ফোটে, ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে মানুষের সৃষ্টির ধারাও অব্যাহত থাকে, থাকে বলেই এই ভয়াবহ আবহে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সচল রেখেছে লেখনী, তাদের কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী। সেই সব রচনা নিয়েই প্রকাশিত হলো আমাদের কোরক।

যারা লেখা দিয়েছে-আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সেগুলি প্রকাশ করে তাদের সৃষ্টির প্রেরনাকে সচেষ্ট রাখা। লেখাগুলির মান-সমান নয়-ভালো মন্দ মাঝারির মিশেল দিয়েই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হল। এই 'লকডাউন' আবহে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সক্রিয় ভূমিকা, পত্রিকা উপসমিতির সহযোগিতা, বিশেষত অধ্যাপক ড. সমীর কুমার নস্করের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের মন্থরগতিকে দ্রুততা দান করেছে-যারা অলক্ষে থেকেও আমাদের কাজে সমর্থন জুগিয়েছেন তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে নীহারিকা উদ্যোগের কর্ণধার শ্রী অশোক দে সরকার মশাইকে। তিনি নিরন্তর যোগাযোগ রেখে এই পত্রিকা প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছেন।

পত্রিকা উপসমিতির পক্ষে-

কেশবচন্দ্র খাঁড়া

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাম্প্রতিক কালে আমরা যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রখ্যাত নট নাট্যকার ও চিত্রাভিনেতা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যকার ও সংগীতশিল্পী	স্বাতী লেখা সেনগুপ্ত
কবি ও সাহিত্যিক	অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ
চিত্রপরিচালক	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
চিত্রাভিনেতা	ঋষি কাপুর, ইরফান খান
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী	গুলাম মুস্তাফা খান
এ্যাথলিট	উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং
বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা	দিলীপ কুমার
ফুটবল রাজপুত্র	দিয়েগো মারাদোনা
ভারতের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার	যশপাল শর্মা

ও আরও অন্যান্য গুণিজন।

আমাদের কলেজের ইংরাজী বিভাগের **অধ্যাপিকা ড. সুতপা চৌধুরীর** অকাল প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ, তাঁর শোকাহত আত্মীয় পরিজনদের প্রতি কলেজের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাই।

ছোট্টো ফুল

স্বর্ণালী করাতি
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

ছোট্টো একটি ফুল
তার ছোট্টো পরিচয়।
জন্ম তাহার ছোট্ট ছোট্ট বাগানে
হয়তো কখনো শ্যাওলা ধরা
ছোট্ট ছোট্ট হবে।

ছোট্ট ফুলের ছোট্ট স্থান
দেবতার দুটি পায়ে
কখনবা আনন্দের উৎসবে
অথবা প্রেমিকার সুন্দর দুটি হাতে।

দুঃখ তাহার অনেক আছে
বোঝেনা কেউই!
ছোট্ট অবহেলায়
পথের বাঁকে ফেলিয়া যায়
সবাই ছোট্ট ছোট্ট রাগে অভিমানে।

নাম তাহার ভিন্ন ভিন্ন
ছোট্ট ছোট্ট কথা।
ছোট্ট ছোট্ট পাপড়ি মেলে
কয়েকদিনের তরে
ছোট্ট পথে চলা।

আষাঢ়ের রাত

রিয়া পাল
জুলজি অনার্স

আষাঢ়ের রাত বড়ো রাগী সে জানেনা
হাসতে মাঝে মাঝে সে কাঁদে, আবার
গর্জায় যখন জোরে, কেউ পারে না
থামাতে।

এইরাত করেছে আড়ি চাঁদের সাথে,
দুজনে দেখতে নারে একে অপরে।

কালো মেঘ বন্ধু তার, সে তাকে রোজ
কাঁদায়, তারা'রা তার শত্রু কারণ তারা
তাকে হাসায়।।

জানেনা সে হাসতে, শুধুই জানে
কাঁদতে, তাই সে নিজেকে ঘিরে
রেখেছে অবহেলাতে।

তবু এ রাতের কাছে আছে অনেকের
ঋণ, তারাই বোঝে এই কারণ, যারা
সঙ্গহীন।

পূজোর আগমন

রিঙ্কি নস্কর
বাংলা অনার্স (প্রথম বর্ষ)

শিশির ভেজা ঘাসের ডগায়
শিউলি পড়ে ঝরে।
পেঁজা তুলোর মেঘ আকাশে
নতুন স্বপ্ন আঁকে।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহালয়া,
কাশের ঝালর দোলা–
সব মিলিয়ে মনটা যেন,
আনন্দেতে ভরা।
আর মাত্র কয়েকটা দিন
পড়বে ঢাকে কাঠি।
চলনা সবাই আজকে আমরা
নতুন সাজে সাজি।
'যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরূপেন সংস্থিতা।'
মাগো, তোমার আশীর্বাদে
পুণ্য হোক এ ধরা।

আগমনী

সমতা সাউ
জুলজি অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

কাশের দোলা যায় না ভোলা
মাতায় সবার প্রাণ,
রোদের সোহাগ, ছড়ায় সে ফাগ
হয় না সে– যে ম্লান।

দিঘির পাড়ে বারে বারে
শুনি পাখির তান,
দূর্বা ঘাসে শিশির হাসে
শরৎ ঋতুর দান।।

নীলচে আকাশ, শিউলি সুবাস
ঝরায় খুশির বান,
নতুন সাজে, সকাল সাঁঝে
কে দেয় যেন টান.....।

পূজোর ছবি মনেই আঁকি
আঁকি মাঠের ধান,
মিষ্টি সুরে বাজলো বেনু
শারদ শোভার গান।।

বই

জবা মজুমদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (প্রথম বর্ষ)

(১)

কহি নাকো কোনো কথা
চুপ করিয়া থাকি রাখো যেথা।।
যেখানে রাখো সেখানেই থাকি।
পড়াতে তোমরা দিওনা ফাঁকি।।
ইতিহাস, ভূগোল, নানা বিষয়ে
রচিত আছি আমি
আমার চেয়ে পৃথিবীতে
নেই যে কিছু দামী।।

(২)

পরে বুঝিবে মোর মর্ম
এইসব না ভাবিয়া
করিয়া যাও আপন কর্ম।।
জানি ভালো লাগে না।
তবু সময় করিয়া
পড়িয়া ফেলো মোরে।।
খ্যাতি, যশ লাভ করিবে
সারাটি জীবন ধরে।।

একলা জীবন

জুই মজুমদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (প্রথম বর্ষ)

একলা একা কাটে আমার দিন
দিনগুলি কেন হয় না রঙিন।।
তাকিয়ে থাকি আকাশ পানে চেয়ে
রামধনুতে গেছে আকাশ ছেয়ে।।
সন্ধ্যা হতেই বেরিয়ে এল চাঁদ
বুঝিনি কখন হয়েছে গভীর রাত।।
রাত্রিবেলায় কারেন্ট গেল চলে
জোনাকির আলো নেভে আর জ্বলে।।
আজ আমি বড়ই থাকি একা
হয়না কখনও আপনজনের সাথে দেখা।।

শান্তির সন্ধানে

সোনালী ভট্টাচার্য্য
বি.এ. (তৃতীয় বর্ষ)

জীবনযুদ্ধের সৈনিক আমরা
জন্মেছি এই শর্তে
যুদ্ধের পরিবর্তে যুদ্ধ
শান্তি এল না মর্ত্যে।
ধর্মযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ
চলে সময়ের আবর্তে।।

আশায় আশায় কাটে দিন
শান্তি এল বুঝি
স্বল্পসুখের অনুভবে
শান্তির দিন খুঁজি।
একটু সুখের আশায় আমরা
যুদ্ধ করতেও রাজী।।

চলল লড়াই সময় ধরে
শুধু শান্তির আশায়
এবার এলো শোনার সময়
তোমার জয় না পরাজয়
ভাগ্যের এই বিচার সভায়
উপস্থিতির পালা
কার গলায় উঠবে আজি
সুখের জয়মালা?

বিধির বাণী বলে সবাই
"যুদ্ধ নয় শান্তি চাই"
নিজেকে প্রশ্ন করেই দেখো
সত্যিই কি আমরা শান্তি পাই?
ক্ষণেক সুখের হদিশ পেয়েই
শান্তি খুঁজে বেড়াই।।

এল সময় যুদ্ধ করার
কাউকে পাওয়ার কাউকে হারাবার
দিনের পর কাটে দিন
আর থাকে না ধৈর্য্য
কেউ যেন এসে বলে–
ক্লান্ত হয়ো না, হবে যে ব্যর্থ।।

উচ্ছ্বসিত হল সবাই
শান্তির হল জয়
আর রবে না দুঃখ
আর রবে না ভয়
শুরু হল শান্তির দিন
সাক্ষী রইল সময়।

ফেসবুক

সোনালী ভট্টাচার্য্য
বি.এ. (তৃতীয় বর্ষ)

জগৎ জুড়ে একটাই নাম
সেটা হল ফেসবুক
চেনা জানা অচেনারও
দেখা এটা মুখ।

টাইমপাসের মন্ত্র এটা
অস্ত্র হল চ্যাট
রিচার্জ করতে যদিও লাগে
লাগে নাতো ভ্যাট।

পিক-পোস্টে সময় লাগে
লাইক আসে কত
ফ্রেন্ডলিস্টের অনুমানে
লাইক বাড়ে তত।

নোটিফিকেশন এলেই মনে
কৌতুহল বাড়ে
না জানি কে কমেন্ট দিল
পোস্টের সম্ভারে।

টাইমপাসের অজুহাতে
সবাই করে ফেসবুক
উপকারে লাগলে এটা
উজ্জ্বল হবে বিজ্ঞানের মুখ।

কলেজ ম্যাগাজিন

বিক্রম গোস্বামী
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

কলেজে এসে হঠাৎ শুনলাম
ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে।
আমার মনের ইচ্ছা জাগলো
কিছু লিখতে হবে।
কি লিখব কি লিখব
পাইনা কিছুই খুঁজে,
নিরাশ মনে জাগলো আশা
লিখতে হবে বুঝে।
সারাদিন ভেবে ভেবে
পেলাম বিষয় রঙিন।
আমার কবিতার বিষয় হবে
কলেজ ম্যাগাজিন।
লেখালিখি শুরু হলেও
ছন্দ মিলছে না যে,
লেখার মাঝে কাটাকুটি
শুনতে লাগছে বাজে।
নিজের ওপর বিশ্বাস যে
কবিতা আমি লিখব
ছন্দপতন হবে না যে
সেটাই খেয়াল রাখব।
সকল চেষ্টা বৃথা না হয়
কবিতা হয় বেশ
অবশেষে ছন্দ মিলে
কবিতা হয় শেষ।

মানবিকতা

বিপাসা দাস
বি.এ. সাধারণ, (দ্বিতীয় বর্ষ)

হঠাৎ করে বিকট আওয়াজ
ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রাণ
মানবিকতা লুপ্ত আজি
হিংসার জয় গান।

কেউ বলছে হিন্দু আমি
কেউ বা মুসলমান
নানা ভাষা নানা ধর্ম
মানুষের রক্ত সমান।

লন্ডন থেকে কাশ্মীর
জঙ্গীরা আজ মহাবীর
আমার তোমার মতো মানুষ
তারা হারিয়েছে মান আর হুঁশ।

নিজেরা মারছি নিজেরা মরছি
জানিনা, কি যে ভুল করছি।
তবুও আমরা লড়ছি লড়ব
মানুষ বলেই সমস্বরে বলবো।

রক্ত দিয়ে হলেও তাই
মানবিকতার রক্ষা চাই-ই-চাই।।

মনের কথা

মধুমিতা গায়েন
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স
(দ্বিতীয় সেমেস্টার)

আকাশে উড়িছে মেঘ
বাতাসে কুসুমের ছোঁয়া।
মন নাচে ছমছম
একি পাগলা হাওয়া?
নিজের সঙ্গে তুলনা করে
নিজের প্রতিচ্ছায়াকে
নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলে
নিজেকে সে খুঁজে পাবে?
নিজের মনের বেদনাকে
উড়িয়ে দিলে আকাশে
দেখতে পাবে মনটি নিজের
উড়ছে খোলা বাতাসে।
বেদনা নিয়ে থাকো যদি
দেখতে পাবে অন্ধকার।
খুশির সাগরে ডুব লাগালে
থাকবে শুধু আলো তার
জীবন মানেই বিপদ অনেক
তারই মাঝে সুখের ছোঁয়া।
হাত বাড়ালে তাহার পানে
দেখবে জীবন সুখে ভরা।

শরৎ আসে

মধুমিতা গায়েন
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

কাশের দোলায় শরৎ আসে
ধানের ক্ষেতে শিশির ভাসে।
ভোরের বেলায় শিউলি ফুলে
মুক্ত ভাসে ভুইয়ে ভুঁয়ে।
বাতাসে তার গন্ধ ভাসে
মেঘের সারি নীল আকাশে।
কাশের দোলায় শরৎ আসে।

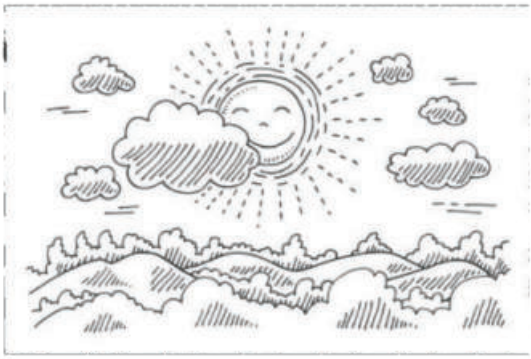

শাখায় শাখায় ফুলের বাসে
ভ্রমরা ওঠে কী ? উল্লাসে
ফুলের গন্ধ পাগল করে
ভোরের বেলায় স্বপ্নটাকে।
নতুন দিনের অভিলাষে
কাশের দোলায় শরৎ আসে।

কাশের দোলায় শরৎ আসে
হৃদয় নাচে পাল্লা দিয়ে সবুজ ঘাসে ঘাসে।
ঝোপের পাশে জোনাকি জ্বলে,
আঁধার নামে সোনা রোদে।
সোনালী আলো ছড়িয়ে দিয়ে
কাশের দোলায় শরৎ আসে।

স্মৃতির পাতায়

অদিতি সেনাপতি
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

আজ কয়েক বছর পরে
ঘুরে ফিরে আসে,
পুরানো দিনগুলির সুমধুর স্মৃতি।
হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে
বেঁচে থাকে, কল্পনার স্মৃতি হয়ে।
কিছু কল্পনা ছিল, গানের বোলে
আবার কিছু ছিল, না দেখার খেয়ালে।
আজ জীবনের পথ পাল্টিয়েও
থেমে থাকেনি, স্বপ্নের গভীরতা।
বাস্তব পরিস্থিতির সাথে
মোকাবিলা হয়ে গেছে,
নিত্য নতুনের সাথী হয়ে।
তাই, এই হৃদয়ের মাঝে,
তুমি ছিলে, তুমি থাকবে,
স্মৃতির নতুন পথযাত্রী হয়ে।।

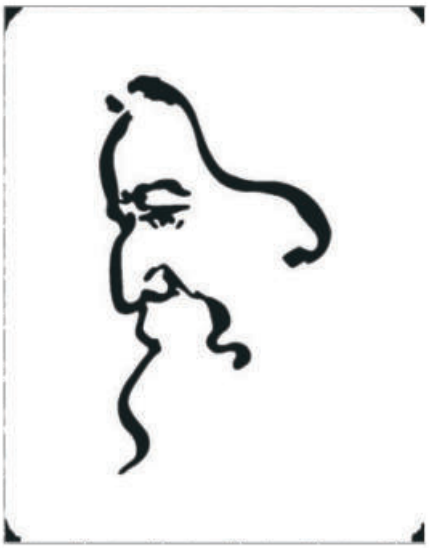

বিশ্ব কবি

সুস্মিতা সাঁত্রা
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

জোড়া সাঁকোতে জন্ম তার
নামটি হল রবি।
আমরা তাকে সবাই চিনি
মস্তো বড়ো কবি
গীতাঞ্জলি লিখে পেলেন
নোবেল পুরস্কার।
আমরা তাঁকে সবাই জানাই
শত নমস্কার।

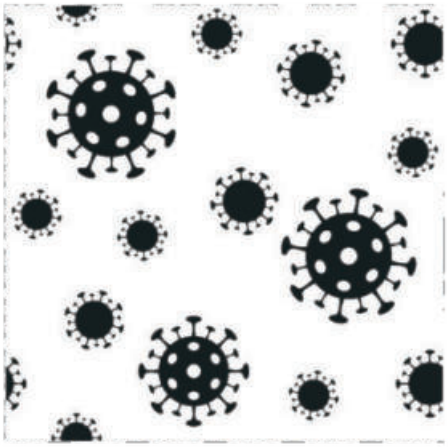

নোবেল করোনা ভাইরাস

নুপূর সাঁতরা
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

চীন দেশে উৎপত্তি
নামটি তার করোনা
দেশ বিদেশে ছড়িয়ে গিয়ে
মৃত্যু ঘটল অনেক জীবনের
জীবন সুদ্ধ বাজি রেখে
অনেক মানুষ লড়ছে শেষে
বাঁচার জন্য দরকার
শুধুই মাত্র প্রতিকার।

মাতৃ ভাষা

দিশা কাঁড়ার
বাংলা অনার্স
(দ্বিতীয় সেমেস্টার)

রক্তমূল্য দিয়ে কিনেছি আমরা,
মাতৃভাষার স্বাধীনতা।
হাসিমুখে প্রাণ দিলো যারা,
মাতৃভাষার তরে,
তাদের শোকে বাংলা মায়ের
দুই চোখে অশ্রু ঝরে।

বাংলায় মোরা কথা বলি,
আর বাংলায় গাই গান।
বাংলা আমার মায়ের আঁচল,
গলার কণ্ঠহার।
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা,
আমার অহংকার।

মা

শুভাশীষ দেব বর্মন
বি.এ. সাধারণ (দ্বিতীয় বর্ষ)

তোমার দ্বারা এ জীবন আমার
তুমি আমার সুখ, দুঃখের সাথী
জীবনের কলরব।

প্রথম চোখে দেখে তোমায়
হয়ে যাই আমি ধন্য।
সারাজীবন থাকব ঋণী, শুধু তোমার জন্য।
তুমি আশা, তুমি ভরসা।

সুখ–দুঃখ তোমার নামে
জীবনে যা পেয়েছি আমি
সব দুঃখের শেষে তুমি ফোটাও মুখে হাসি
তাই তো বলি আমি শুধুই তোমায় ভালোবাসি।
কখনো যদি ভুল করে দিয়ে ফেলি কোনো দুঃখ
ক্ষমা করে দিও তুমি, হয়ো নাকো ক্রুদ্ধ।
যদি কখনো দূরে চলে যাই তবুও থাকবো তোমার পাশে
মা, তুমি আমার জীবনে মরণে,
তুমি আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে।

আমার ভারত, তোমার ভারত

পৌষালী ঘোষ
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

তোমার ভারত রোজ স্বপ্ন দেখে,
নতুন করে বাঁচতে শেখে।
যেন বুকেতে টুইটারেতে পোষ্ট করে রোজ–
বাজারে গিয়ে ইলিশের দাম নিয়মিত করে খোঁজ।

আর আমার ভারত রক্ত মাখা,
তরুণ তাজা প্রাণ–
দেশের জন্য লড়াই করে
করেছে জীবন দান।

তোমার ভারত গাড়ি চড়ে,
বিলাসিতার আঁতুরঘরে–
আমার ভারত ধূলায় গড়ায়,
এদিক সেদিক রক্ত ছড়ায়
তোমার ভারত রোজ সকালে চায়ের সাথে খবর দেখে
শেয়ার কত ওঠে নামে রোজ তার খবর রাখে।

আর আমার ভারত, গুলির শব্দ
চারিদিক নিঃস্তব্ধ,
স্বজন হারানো কান্না আসে
নয়ন দুখানি জলে ভাসে।

তোমার ভারত, খবর রাখেনা আমার ভারত গড়ার,
তোমাদের ঠান্ডা ঘরে উঁচু পোষ্ট আর চেয়ার।

আমার ভারত, যুদ্ধ শেষে নিথর দেহ কত তরুণ প্রাণ–
রক্তমাখা স্বাধীন ভারত তাদের অবদান।

তোমার ভারত, আমার ভারত সবার ভারতবর্ষ সে,
তোমার জন্য করব লড়াই, তুমিই মোদের গর্ব হে।।

বন্ধু

সাধনা বাগ
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

বন্ধু মানে সুখ দুঃখের সাথী
বন্ধু মানে আড়ি
বন্ধু মানেই ভাব
বন্ধু চিরসাথী।
বন্ধু মানে মন খারাপের ঠিকানা
বন্ধু মানেই ঝগড়া ঝাটি।
বন্ধু মানেই গল্প আড্ডায় মজা
বন্ধু মানেই রোজ বিকালের খেলাধূলা
আনন্দ ঝলমল।
শ্রাবণের ধারার মতো
বন্ধু তোমার হাসি,
গোলাপ ফুলের মতোই আমি
তোমায় ভালোবাসি।
আমি, তুমি বন্ধু ছিলাম
আছি এবং থাকবো
সব কিছুর মধ্যে আমি
তোমায় মনে রাখবো।

বসন্ত

পায়েল সাধুখাঁ
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স
(দ্বিতীয় সেমেস্টার)

বসন্ত মানে আনন্দ
বসন্ত মানে রং, শান্তিনিকেতন
আবীরের গন্ধ।

বসন্ত মানে পলাশের গন্ধ
বসন্ত মানে কোকিলের ডাক
পরিযায়ীদের আসা যাওয়া।

বসন্ত মানে সরস্বতী পূজো
স্কুল কলেজে প্রীতিভোজ
বসন্ত মানে অল্প ঠান্ডা
বসন্ত মানে হলুদ শাড়ি পরা
মেয়েদের দল।

কিন্তু
বসন্ত শুধু আনন্দ দেয় না
বয়ে নিয়ে আসে অসুখ
গরীবের মুখে দুঃখের ছায়া
তবু আমার কাছে সেরা
ঋতু বসন্ত।

আমার আমি, ভীষণ দামী

টুম্পা মন্ডল
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (তৃতীয় বর্ষ)

আমার আমি টা না বড্ড দামী,
কেন জানো ?
ভীড়ের মাঝে তুমি সবাইকে দূরে সরিয়ে
আমাকে আগলে রাখো বলে।

আমার আমি বড্ড দামী,
কেন জানো ?
সুখে দুঃখে তোমায় পাশে পাই বলে।

আমার আমি বড্ড দামী,
কেন জানো ?
এই শহরের হিংস্র মানুষগুলোর থেকে আমায়
লুকিয়ে রাখো বলে।

আমার আমি বড্ড দামী,
কেন জানো ?
যখন কেউ ছিল না, তখনও তুমি আমার সাথে
ছিলে বলে।

আমার আমি বড্ড অভিমানী,
কেন জানো ?
যখন খুব অভিমানে মন খারাপ করি, তখন তুমি
এসে বোঝাও বলে।

আমার আমি ভীষণ দামী,
কারণ আমাকে দামী করা মানুষটা যে তুমি।।

দুঃসংবাদ

টুম্পা মন্ডল
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (তৃতীয় বর্ষ)

আমি পিছলে পড়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াতে পারবো না
ভেবে অট্টহাসি হেসেছিল যারা,
তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

আমি ভেঙে পড়েছি ভেবে, আনন্দ পেয়েছিল যারা,
তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

আমাকে হারতে দেখে, ভয়ের হাসি হেসেছিলে যারাা,
তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

আমার শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে মজা করেছিল যারা,
তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

আমি কালো বলে, সমালোচনা করেছিল যারা,
তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

আমি মেয়ে বলে, আর পড়াতে হবেনা বলেছিলে যারা,
তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

হ্যাঁ দুঃসংবাদ তাদের জন্য,
তাদের দুঃসংবাদ দেবার জন্য হলেও,
আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।।

ভারতমাতা কাঁদছে

শুভজিৎ সিং
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

সেই দিন প্রাতে উঠে ঘুম থেকে
হল যেন মনে,
কুটির বাহিরে কেউ ডাকিতেছে আমাকে।
খুলে দেখি দ্বার।
অবন ঠাকুরের কল্পিতা ভারত মাতা
দাঁড়িয়ে সম্মুখে আমার।।

কহিলাম আমি এসেছো মা তুমি
তবে কেন বাহিরে আর।
এসো মা কুটিরে পুজিব তোমারে।
আজিকে শতবার।।

হঠাৎ দেখিনু মায়ের চোখে জল
করে ছল ছল।
বলিলাম আমি কাঁদিতেছো মা তুমি
কী কারনে বল।।

যেখানে তোমার ছেলে নানা ধর্ম মিলে মিশে
রহিয়াছে যেন ভাই ভাই।
বলিলেন মা তাহলেতো আমার
দুঃখ থাকিত নাই।।

স্বার্থে ডুবে আছে দ্বন্দ্বে মেতে আছে
দেখিয়া মম বুক ভেঙে যায়
তাই বলি আমি ''ছড়াও শান্তির বাণী''
ভারতমাতা যে কাঁদছে।।

ফুলের কুঁড়ি

লিসা বাগ (শিক্ষাকর্মী)

লিখতে বসে হাজার কথা ভীড় করে আসে মনে
কি লিখব মনে মনে ভাবি।
চিন্তায় স্রোতে ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায় পলে পলে
নিত্য দিনের সুখ–দুঃখের নানা ছবি
আসে, সরে যায় সিনেমার পর্দার মতো
এই তো পাশের বাড়ির মিনির ছবি।
ছোট্ট ফুট ফুটে মেয়েটি জন্মালো যেদিন
আনন্দের ঢেউ এসে লেগেছিল
আমাদের বাড়িতেও।
প্রথমে কোলে চড়ে, স্নেহ ভরা বুকে
কী আনন্দের স্পর্শ
মাটিতে পড়তে পায়না
পূজার পবিত্র ফুল যেন।
বছর ঘুরতেই ছোট ছোট পায়ে
কখনও দাদুর হাত ধরে, কখনও বা নিজে নিজেই
এসে পড়ে, বয়ে যায় খুশির হাওয়া
দু'চোখে স্বপ্ন তার বড় হবে।
বাবা মা ভাবে রাজরানী হবে।
রাজপুত্রের সন্ধান ও পাওয়া গেল
কলেজে পড়তে পড়তেই
সানাই বাজল রাজকীয় পরিবেশে
রাজরানী বেশেই বিদায় নিল সে
বছর দুয়েক পরে ভোরের বেলা এল দুঃসংবাদ।
আগুনে আধ পোড়া দেহ পাওয়া গেছে তার
পনের দাবীতে মাতাল
স্বামীর অত্যাচার থেকে
মুক্তি পেতে সে চলে গেছে
রেখে গেছে অসহায় এক ফুলের কুঁড়ি।

ছোট্টো মনে ছোট্টো স্বপ্ন

অরিন্দম সাবুই
বি.কম অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট ছেলে
নাম অরিন্দম।
বড়ো হয়ে করবো আমি
জগৎ জোড়া নাম।।

লেখা পড়া শিখে আমি
ব্যবসা শুরু করবো।
পরিশ্রম করে আমি
অনেক ধনী হবো।।

গরীবদের করবো সেবা
রাখবো হাসি মুখে
বাবা–মাকে বাসবো ভালো
রাখবো পরম সুখে।।

হবে একটা স্বপ্নের বাড়ি
থাকবো সবাই সাথে।
সব বাধাকেই হারিয়ে দেবো
আমরা সুখে দুঃখে।।

গাড়ি ঘোড়া চড়ে আমি
দেশ বিদেশে ঘুরবো।
স্বদেশের কাজ করে আমি
দেশের নাম উজ্জ্বল করবো।

এই যে হলো আমার স্বপ্ন
তুচ্ছ করোনা তো কেহ
তাই বলছি এই স্বপ্ন
সত্যি করে দেখাবো।

রং বীর

শুভজিৎ কোলে
বি.কম অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

লাল, নীল, কমলা ও
সবুজের পাশে
গোলাপি আবির
ফিক ফিক হাসে !

গুলে খেলার রং আছে
একদম পাকা,
বাহারি টুপিও মেলা
নকশা আঁকা।

ঝুলে থাকা পিচকারি
খায় টোকাটুকি
হামলে পড়ছে সেথা
যত খোকা খুকি।

হোলির এ দোকানের
নাম রংবীর
পড়ছে লম্বা লাইন
থিক থিক ভিড়।

বাইরে মন

সৌরভ দাস
ইংলিশ অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

বাইরে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে–
ভেতরে আমি একা,
ফনি না বুলবুল কার সাথে বেশ দেখা।
নিশ্বাস–প্রশ্বাস জমে হিম,
টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মাথা ঝিমঝিম।
পোয়ারো না দ্যুঁপে–কোনটা পড়ি ভাই,
ডিটেকটিভ ফিক্সনে হোমেস্‌র বিকল্প নাই।
ফিরে দেখা? নাকি এগিয়ে যাওয়া?
বর্তমানের পাওয়া? নাকি ভবিষ্যতের চাওয়া?
চঞ্চলা মন, থাকে না কোন ক্ষণ–
ময়ূরের পাখা মেলে থাকে সারাক্ষণ।

SUCCESS

Sourav Das
English Honours (4th Semester)

Failure is not a destiny.
Success is not a destination,
You are like a crew,
Success or failure–Just a point of view.
Step out or give up–what you will chose,
Be hard or rather you will be lose.
Play with your mind,
Play a game –
Struggle is your aim.

MACBETH

Macbeth, Macbeth, don't cry,
Lady Macbeth says, "good bye"
"Fair is foul, foul is fair"
Your ruin is very near.
Crime is your slime,
What an ambition makes you prime.
O dear "full of sound and fulry-
signify nothing,"
Blood makes you to bathing.

রোদ্দুরের অপমৃত্যু

রুপক জানা
ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন (SACT)

হঠাৎ শিক্ষা নিয়ে ভাবতে ভাবতে মনে হল, কোথায় যেন শিক্ষার মধ্যে থেকে, রোদ্দুরের আঁচ ক্রমশই চলে যাচ্ছে।

সেই রোদ্দুর, যা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখায় স্থান পেয়েছে একদিন।

কিংবা সেই রোদ্দুর যার তীক্ষ্ম স্বর একদিন তোলপাড় করেছে, সমস্ত সোস্যাল মিডিয়া।

রোদ্দুরকে যেন প্রতি পদে আমরা ক্রুশবিদ্ধ করছি,

সমস্ত স্বাধীন চেতনাকে যেন বিসর্জন দিয়ে উলঙ্গ রাজার দেশে হারিয়ে গেছি।

হয়ত আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই সেই রোদ্দুর প্রতি মূহূর্তে আনাগোনা করে,

হয়ত আমরা অন্তর থেকে সেই রোদ্দুরের কোমল আঁচ পেতে চাই,

যা আমাদের সত্যের সন্ধান দেবে।

বাস্তবের চোখ খুলে দেবে।

কবিগুরু তাঁর শিক্ষাভাবনার মধ্যে রোদ্দুরকে ভালোবেসেছিলেন, তৈরি করতে চেয়েছিলেন এরকম শত শত রোদ্দুর।

কিন্তু সে আর হল কোথায়।

আমরা তো আজ বন্ধ খাঁচার মধ্যেই রয়ে গেলাম বোবা তোতা হয়ে,

খাঁচার পরিধিটা অবশ্য একটু বেড়েছে।

অস্তিত্বের সংগ্রামে আর সামাজিক স্বীকৃতির তাগিদে আমাদের অন্তঃসত্তার রোদ্দুরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি,

এইভাবেই হয়ত রোদ্দুরের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

তাকে খুঁজে পেয়েছ ?

স্বাগত খাঁড়া
বি.এস.সি. জেনারেল (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই
যদি নীরবে যাই গো চলে
স্মৃতিটুকু শুধু রয়ে যায় তবে,
চিতায় দিয়োগো ফেলে।।

তোমাকে খুঁজতে ধরায় এসেছি
যন্ত্রনাকেও আঁকড়ে ধরেছি,
'খুঁজে পাব'–এই আশা নিয়ে মন
করে যায় প্রতিক্ষণ, নির্মমভাবে জীবনযাপন
এই জীবনেরই পথে চলতে চলতে
মুখ থুবড়ে হঠাৎ পড়েছি,
তবু, তোমাকে সঙ্গী করে, আবার হাঁটতে শুরু করেছি।

কত মেঘ আসে, কত ঝড় যায়
দাঁড়িয়ে দেখি মনের আঙিনায়
কত ঢেউ ওঠে, প্রাণ খেলা করে
অশ্রুর ন্যায় কিশলয় ঝরে পড়ে,
তবুও, এই রাতের দেশে সকাল হতে দেখেছি
রৌদ্রতাপে উজাড় করে নিজেকে মেলে ধরেছি।

'বহু মুখে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।''

কবির ভাষার মর্ম ধরে
ছোটবেলা থেকে এই লেখাপড়ে
এখন দাঁড়িয়ে কৈশোর মোড়ে–

অশ্রুধারা সাঁতরে আমি, অবশেষে কূল পেয়েছি,
সুঃখ দুঃখের খেলাঘরে তাই নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি।
অবশেষে তাই জানাই বিদায়
এই ভুবনের মোহ–বাসনায়–

জীবন পদ্মে স্পন্দিত এই মন নিয়ে মেতে উঠেছি
তোমার কৃপায় মরেও, পুনরায় প্রাণকে তুলে ধরেছি।

দ্রষ্টব্য ঃ

আমার এই লেখা 'তাঁকে' অর্থাৎ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে উদ্দেশ্য করে।
তার পাদপদ্মের স্বর্ণাঙ্কিত চরণাঙ্গুলিতে আমার এই লেখা নিবেদিত।

ম্যাগাজিন

বিদিশা চক্রবর্ত্তী
বি.এস.সি. জেনারেল
(চতুর্থ সেমেস্টার)

১০ তারিখে নোটিশ এলো
ছাপা হবে ম্যাগাজিন
বাড়ি এসে হিসাব করলাম
হাতে মাত্র কয়েকটা দিন।
লিখতে হবে ভ্রমণ কাহিনী
গল্প কিংবা ছড়া
বিষয়বস্তু ভাবতে বসলাম
বন্ধ ক্লাসের পড়া।
বাবা ভীষন রেগে গিয়ে
কষিয়ে দিল দুচার ঘা
আমি তখন জেদ করলাম
কবিতা আমি লিখব না।
একে একে দিন শেষ হল
ছাপা হল ম্যাগাজিন
সূচীপত্রে নামটি দেখে
নেচে নিলাম তা ধিন ধিন।

মা

চিরশ্রী চ্যাটার্জী
ইংলিশ অনার্স
(চতুর্থ সেমেস্টার)

মা যে আমার পরম প্রিয়
একান্ত আপন,
মাকে ছাড়া আমার যেন
কাটেনা দিনক্ষণ।
সবাই বলে দেবতা আগে
আমি বলি না তো,
আমার কাছে পরম প্রিয়
আমার আপন মা তো,
আমার অসুখে রাত জেগে মা
সেবা করেন একা
তখন কই ঠাকুর এসে
দেয়না কভু দেখা
আমি জন্মভূমির মতোই মানি
আমার আপন মাকে,
মায়ের আশিস যেন আমার
জীবন জুড়ে থাকে।।

দূষণ মুক্তি

সুপ্রিকা গাঙ্গুলী
বাংলা অনার্স (প্রথম বর্ষ)

শস্য শ্যামালাযুক্ত এই পরিবেশে,
যেখানে আছে সবুজের আনাগোনা।
যাকে আমরা বসাই মায়ের আসনে,
সেই পরিবেশ আজ পরিপূর্ণ দূষণে।

আজ ধ্বংস হচ্ছে জীবনদাতা অরণ্য,
মারা যাচ্ছে বন্যপ্রাণী যত।
পৃথিবীর বুকে কমছে সবুজের সমাবেশ,
ধ্বংস হচ্ছে মৃত্তিকার উর্বরতা।

দূষিত হচ্ছে প্রাণদাতা জল,
মিশছে বহু আবর্জনার দল।
ফাটছে বাজি কাঁড়িকাঁড়ি,
বাড়ছে এখন অনেক গাড়ি।

বরফ গলছে বাড়ছে জল,
ডুবছে আমাদের ধরাতল।
তাই আজকে সবাই গড়ি,
সবুজ গাছগাছালির অনেক নতুন সারি।

চাঁদনি রাত

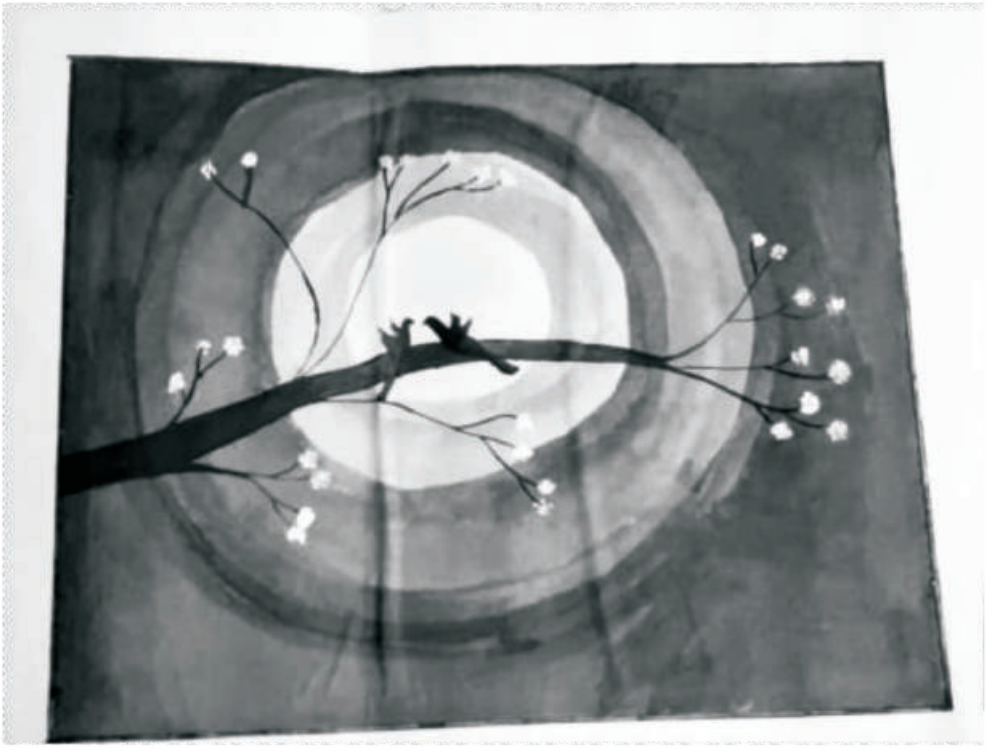

Fajrul Haque
B.A. 2nd Semester (General)

করোনার কবিতা

অধ্যাপক কেশবচন্দ্র খাঁড়া

(১)

মার্চের মাঝামাঝি দু'হাজার কুড়ি
চীন থেকে নেমে এল ভাইরাস উড়ি।
নাম তার করোনা
পাসপোর্ট ছিল না
একে একে ছেয়ে গেল সারা দেশজুড়ি।

(২)

সাবধান ! সাবধান ! এলো ঐ করোনা।
চটপট ঘরে ঢোকো বেয়াদপি কোরোনা।
নিয়ম না মানলে
পুলিশেতে ধরলে
জেলে যেতে হতে পারে, নয় জরিমানা।

(৩)

করোনার হাঁকাহাঁকি দরজার বাইরে।
ছেলেবুড়ো সকলেই ঘরে আছে তাইরে।
রাস্তায় আছে ঝুঁকি
জানালায় মারে উঁকি
পড়ে যদি ঘরে ঢুকি পরিত্রাণ নাইরে।

(৪)

দিনরাত ডিউটিতে এসে যেত ক্লান্তি–
'ছুটি চাই' 'ছুটি দাও' হবে তবে শান্তি।
লকডাউন এনে দিলে
হাড়ে হাড়ে টের পেলে
ছুটি চাওয়া ব্যাপারটা ছিল বড়ো ভ্রান্তি।

(৫)

'লকডাউন' শব্দটা জমকালো বটে।
এই রূপ ঘটনাতো কদাচিৎ ঘটে।
ট্রেন বাস নেই পথে
বিপনিও বিধিমতে
হেঁসেলটা খোলা শুধু এ ধর্মঘটে।

(৬)

হায় হায় একি হল কার এই ফন্দি।
অপরাধী নই তবু ঘরে থাকি বন্দী।
পুলিশের তাড়া খেয়ে
জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে
অবশেষে ঘরে এসে বই হল সঙ্গী।

(৭)

করোনার যুদ্ধে আছে চার বুলি।
ঘরের ভিতরে থাকো সব কাজ ভুলি।
আরো দুটি আছে টাস্ক
হাত ধোও পরো মাস্ক
সোশ্যাল ডিসট্যান্স, নয় কোলাকুলি।

(৮)

ভয় নয়, করো জয় করোনা ভাইরাস।
এক সাথে ঘরে থেকে কষে তার ধরো রাশ।
মুখোমুখি হবো তোর
মনে যেন থাকে জোর
সকলের প্রতিরোধে তাড়াতাড়ি হবে নাশ।

আমি বীরাঙ্গনা

ঈশিকা দে
বি.এ. সাধারণ (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

আমার জীবনের প্রতিটি মূহুর্তই আমার কাছে স্মরণীয়। সেই মূহুর্তগুলিকে মাঝে মাঝে নিজের মনের মাঝে বাঁচিয়ে তুলি। কিন্তু একটি মূহুর্ত নিজস্ব চোখে দেখা নয় কানে শোনা যা সত্যিই মনের মাঝে জেগে উঠলে ভয় লাগে যা সত্যিই মনের মধ্যে একটি ক্ষতের সৃষ্টি করেছে অদ্ভুতভাবে।

প্রত্যেকটি নারীর কাছেই তার রূপ সৌন্দর্য তার অহংকার। সে যেমনই হোক না কেন, সে তার রূপকে সুন্দর বলে মনে করে। তেমনই একটি মেয়ে ছিল যেমন সুন্দর তেমন শান্ত, মিষ্টি শান্তস্বভাবের মেয়ে নাম তার ছায়া। ঘটনাটি নিজের চোখে দেখা না হলেও সেদিন ঘটে যাওয়া মূহুর্তটি আমার কাছে অজানা নয়। সে খুব খোলামনের হলেও নিজের সৌন্দর্যের প্রতি তার খুবই অহংকার বোধ ছিল কিন্তু এই মেয়েটি কোনদিনও কল্পনাও করতে পারেনি তার এই অহংকারের বিষয়টি তার নামের মতোই ছায়া হয়ে যাবে একদিন সকালবেলা কলেজ থেকে ফিরছিল। হঠাৎ দুটি অচেনা ছেলে তারদিকে এগিয়ে আসে এবং তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় কিন্তু তার প্রস্তাব অস্বীকার করায় ছেলেটি তার সাথে একটি নৃশংস ব্যবহার করে অর্থাৎ মেয়েটির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে এবং বলে ওঠে– তোমার এই সৌন্দর্যই তোমার পতনের কারণ তোমার সৌন্দর্য, তোমার অহংকার, তোমার গর্ব ছিল। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা এখন তোমার নেই, তুমি দুর্বল তাওতো তোমার এই গর্ব, খর্বের কারণ আমি হয়ে উঠতে পারলাম নিমেষে মেয়েটির আর্তনাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার সৌন্দর্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তার চোখে যেমন বৃষ্টির মতো অবিশ্রান্ত জল বয়ে পড়ছিল ঠিক তেমনই প্রতিবাদী হিংসার আগুনও জ্বলছিল। স্থানীয় লোকেরা মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, এবং সেখানে অস্ত্রোপচার–এর পরে মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে। মেয়েটি তার চেহারাটি একবার আয়নায় দেখতে চায় এবং দেখার পর সে অদ্ভুত চিৎকার করে ওঠে, এবং নিজেকে দেখে চিনতে

অস্বীকার করে, এই ঘটনার পর যে মেয়েটির জীবনে ভয়ঙ্কর সময় নেমে এসেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।–

ঠিক তার কিছুদিন পরেই সেইরকম একটি দিনের ন্যায় আরেকটি দিন নেমে আসে তার জীবনে সেই বারের মতো কোন খারাপ উদ্দেশ্যে নিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য সেই দিনও কলেজ থেকে ফিরছিল এবং ফেরার পথে তার আবারও সেই নৃশংস প্রাণীদুটির সঙ্গে দেখা হয়। তখন তারা আবারও মেয়েটিকে বলে যে সৌন্দর্য্য নিয়ে তোমার এত অহংকার ছিল আজ সেই সৌন্দর্য্য কোথায়? তোমার সব সৌন্দর্য্য সারাজীবনের জন্য মুছে দিয়েছি আমরা। মেয়েটি তাদের কথার উত্তর দেয় না কিন্তু সে একটি এমন কাজ করে যা ওই নৃশংস প্রাণীদুটির কাছে তাদের এই ভয়ঙ্কর অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মেয়েটিও ছেলেদুটির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে এবং ছেলেদুটিকে বলে ওঠে ''এতদিন এই পৃথিবীকে আমি চিনতাম না কিন্তু আজ তোরা এই পৃথিবীটাকে আমায় চিনিয়ে দিয়েছিস''। কোনও মেয়ের রূপকে শিকার করবে না, প্রত্যেকটি নারীর মধ্যেই সঞ্চিত থাকে ক্ষোভের আগুন। দেশের প্রত্যেকটি নারী ''বীরাঙ্গনা''। ঠিক তেমনই ''আমি বীরাঙ্গনা আমিই প্রতিবাদী''...এই ধ্বনি চারিদিকে বেজে উঠতে থাকে ''আমি বীরাঙ্গনা আমিই প্রতিবাদী''।

‘আমি ফিরছি’

দিশা কাঁড়ার
বাংলা অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

‘‘জানো মা আর মাত্র একমাস, তারপরেই আমি ফিরছি তোমার কাছে। মা তুমি আমার জন্য নারকেল নাড়ু বানিয়ে রাখবে। কতদিন হলো মা তোমার হাতের রান্না খাইনি। মা তুমি কিন্তু মনে করে আমার জন্য একটা সোয়েটার বুনে রেখো। জানো মা এখানে না বড্ড ঠান্ডা। জানো মা অনেক দামী দামী জ্যাকেট চাপালেও শরীর যেন গরম হতেই চায়না, যতক্ষণ না তোমার হাতে বোনা সোয়েটারটা আমার শরীর স্পর্শ করে।

আমি ফিরছি।

আর মাত্র ১৫দিন, তারপরেই আমি ফিরছি তোমার কাছে মা। তোমার মনে আছে মা গতবার আসার সময় তুমি আমার কোমরে একটা তাবিজ বেঁধে দিয়েছিলে, আর বলেছিলে এই তাবিজ নাকি আমাকে শত্রুদের গুলির হাত থেকে বাঁচাবে, জানো মা ওই তাবিজটা কোথায় পড়ে গেছে। কত খুঁজলাম তাবিজটা তাও পাইনি খুঁজে।

আমি ফিরছি।

জানো মা আমি ফিরছি। আর মাত্র ১০দিন বাকি বাড়ি যেতে। মা, বাবার শরীরটা কেমন আছে? গতবার আসার সময় দেখে এসেছিলাম হাঁটুর ব্যাথাটা খুব বেড়েছিল। আমি চলে আসবো বলে ঐ হাঁটুর ব্যথা নিয়েও বাজারে গিয়েছিল আমার পছন্দের ইলিশ মাছ কিনতে। আমি কতবার বারণ করেছিলাম। বাবা আমার একটা কথাও শোনেনি। মা তুমি দেখো বাবা যেন ঐ ব্যথা নিয়ে বেশিবার যেন বাজারে না যায়।

আমি ফিরছি।

আর মাত্র একদিন তারপরই বাড়ি ফিরে যাবো। জানো মা এই একদিনটা একবছর সমান মনে হচ্ছে, কিছুতেই যেন দিনটা কাটতে চাইছে না। সকাল থেকেই শুধু মনে হচ্ছে কখন বাড়ি যাবো। বাড়ি ফিরেই কখন তোমার মুখটা দুচোখ ভরে দেখব।

আমি ফিরছি।

জানো মা আর মাত্র কয়েক ঘন্টা, আমি ফিরছি তোমার কাছে। আমি এখন উড়োজাহাজে, সুন্দর সুন্দর সুগন্ধীফুল দিয়ে সাজানো ভারতমাতার তেরঙা পতাকায় ঢাকা কফিনে বন্দি। জানো মা কাল দুপুরে ২.২৫মিনিটে জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের কনভয়, হঠাৎ বিধ্বংসী আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ, সেই সাথে চললোগুলির তান্ডবলীলা, ছিন্নভিন্ন হলো ৪২জন জওয়ানের দেহ। মা আমিও তাদের মধ্যে একজন, জানি মা আমার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, আমার শরীর হয়তো চিনতে পারার অবস্থায় নেই কিন্তু কেউ চিনতে না পারলেও তুমি আমায় ঠিক চিনে নেবে। তোমার সাথে যে আমার নাড়ির যোগ। দশ মাস তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছ, আমার শরীরের প্রতিটি অংশ যে তোমার চেনা।

আমি ফিরছি।

দ্যাখো মা তুমি চোখ তুলে দ্যাখো, তোমার ছেলে তোমার কোলে ফিরেছে, তোমার ছেলে শহীদ হয়ে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত হয়ে ফিরেছে। ও, মা, মা তুমি দেখবে না আমায়, শেষবারের মতো ছুঁয়ে দেখবেনা আমার শরীর, তোমার ছেলেকে আদর করবে না মা? ওমা তুমি ওইভাবে কেঁদো না মা। ও সবাই বলছে আমি মরে গেছি তাইতো। মা ওরা অবুঝ, ওরা জানেনা আমি বেঁচে আছি, হ্যাঁ মা আমি বেঁচে আছি, বেঁচে আছি প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে।''

হঠাৎ দেখা

স্নেহা বোস
বাংলা অনার্স ((দ্বিতীয় বর্ষ)

আজকের তারিখটা ০৫.০৫.৩৫ সারাদিনের এই ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ বইয়ের আলমারিটার কোনো এক কোনায় ডাইরিটা চোখে পড়লো। ধুলো জমে একাকার। আমার কাজের দিদি আমাকে বললো ''ওটা ধরো না অনেক ধুলো, তোমার তো ধুলোতে কষ্ট হয়।'' খানিক হেসে আমি বললাম ''থাকনা''। তারপর পাতা উল্টাতে শুরু করলাম। মনে পড়লো কত বন্ধু ছিল আমার স্কুল কলেজে। আজও আছে তারা কিন্তু যোগাযোগটা আর নেই। কেউ ব্যস্ত তার নতুন সংসার নিয়ে কেউ আবার ছেলের স্কুলের পরীক্ষা নিয়ে। দম ফেলার সময়ই নেই তাদের। আমিও কেমন যেন নিজেকে ব্যাস্ত করে রেখেছি। আমার পৃথিবীটা যেন অফিস আর বাড়ির মধ্যেই রয়ে গেছে। কারুর সাথে আর যোগাযোগ রাখার ইচ্ছাটাই আর নেই। হঠাৎ দেওয়ালের একটা ছবি দেখে মনে পড়লো আমিও একসময় আঁকতাম। এইতো সেদিন গ্যালারী খুলতে কত ছবি দেখলাম। চোখটা জলে ভরে গেলো। কাজের দিদি আমাকে খেতে ডাকলো আমি গেলাম ও তখন বললো ''কিগো তুমি পুরানো ডাইরি নিয়ে পড়ে আছো অফিস যাবে না....হঠাৎ আমার চোখের কোনে জল দেখে ও চুপ করে গেল। বললো 'কি হয়েছে তোমার'? আমি বললাম কিছু না, ও তখন হেসে বললো 'কি দরকার এরকম একা একা থেকে। একটা বিয়ে করলেই তো পারো'।। আমি বললাম বিয়ে! আমি প্রত্যেক বারের মতো এবারেও হেসে উড়িয়ে দিলাম কথাটা। তারপর অফিসের জন্য বেরোলাম। আজকে গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে তাই বাসেই যেতে হবে। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে হঠাৎ কানে এল ''ট্যাক্সি যাবে'' খুব চেনা লাগলো গলাটা। ফিরে দেখলাম ষোলো বছর পর সেই প্রিয় বন্ধুটাকে। অবাক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম দুজনে দুজনের দিকে। হাজারও স্মৃতির বন্যা বয়ে গেল। দুজনের চোখই স্তব্ধ। ভাষা প্রায় হারিয়ে গেছে বললেই চলে। সময়ের স্রোতে সব কিছুই ফিকে হয়ে গেছে তাই ভাবলাম পাস কাটিয়ে চলে আসাটাই শ্রেয়।

অনাথ ছেলে

সোমনাথ দলুই
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

আকাশ অনাথ। কে যেন তাকে এক মসজিদ–এর কাছ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে বিবেকানন্দ অনাথ আশ্রমে। তারপর সে ওখানেই বড়ো হতে থাকে। তার একটু শারীরিক অসুবিধার জন্য কেউ তাকে দত্তক নেয়নি। আকাশের হাঁটা চলাটা সাধারণের থেকে আলাদা। তাই সে অনাথ আশ্রমেই বড়ো হতে থাকে। আকাশ মেধাবী ছিল, হয়তো সে শারীরিক ভাবে অসুস্থ কিন্তু মানসিক দিক থেকে ভালোই ছিল। তাই তাকে আশ্রম থেকেই পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সে প্রতিবছর ভালো রেজাল্ট করে তার জন্যও সরকারি স্কলারশিপ পায়। তাদিয়ে আর আশ্রমের কিছু টাকা দিয়ে সে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। পড়াশোনা ছাড়াও তার অনেক প্রতিভা ছিল। পরিত্যক্ত অব্যবহৃত জিনিস দিয়ে নানান জিনিস তৈরি করতো। সব সময় কিছু করার তার মনোভাব ছিল। সে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ঠিক করলো সে আই.টি.আই.–এ পড়বে এবং সে ভর্তি হল অটোমোবাইল বিষয় নিয়ে। যেহেতু তার কিছু তৈরি করবার মনোভাব সব সময় ছিল, তাই সে চিন্তা করতে থাকে বিনা খরচে পেট্রোল, ডিজেল ছাড়া কীভাবে গাড়ি চালানো যায়। সে অনেক চিন্তা ভাবনার পর একটি প্রকল্প তৈরি করে। সে গাড়ির গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে গাড়ি চালানোর উপায় আবিষ্কার করলো। সে তার শিক্ষকের সহযোগিতায় এই পদ্ধতিতে একটি গাড়ি তৈরি করে। অনেক কোম্পানী তার পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গাড়ি তৈরি করছে। সে এখন অনেক টাকা উপার্জন করে আর সেই সব উপার্জনের টাকা দিয়ে সে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের সাহায্য করে। তাদের জন্য বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থাও করে। সেই জন্য সে সমাজের এক সম্মানীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠে। মানুষ তাকে ভালোবাাসে ও শ্রদ্ধা করে। তার নাম সারা দেশে, বিদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন কিছু রাজনৈতিক নেতারা তাকে রাজনীতিতে আনতে চায়। আবার সমাজের কিছু ব্যক্তিরা তার ধর্ম, জাত নিয়ে কথা

বলতে শুরু করে। কেউ বলে ও মুসলিম কারণ ওকে এক মসজিদের কাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। আবার কেউ বলে না ও হিন্দু কারন ও এক হিন্দু অনাথ আশ্রমে বড়ো হয়েছে। তা নিয়ে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক দেখা যায় মানুষের মধ্যে। তখন আকাশকে এক টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। সেখানে তাকে তার জীবনের কাহিনীর সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হয় এবং কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। তাকে বলা হয় যে তুমি অসহায়, অনাথ, ভিখারিদের জন্যই কেন ভাবো? সে উত্তরে বলে- কারণ, আমিও একজন অনাথ, অসহায় ছিলাম, এদের কষ্ট আমিও বুঝি। আচ্ছা তোমাকে বিভিন্ন নেতারা রাজনীতিতে আসার কথা বলছে, তুমি কী আসতে চাও? সে বলে না আমি সকলের নেতা হতে চাই না। আমি সেই সকল মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই এবং নেতৃত্ব দিতে চাই যাদের পাশে কেউ থাকে না সাহার্য্য করার মতো। আচ্ছা তোমার ধর্ম কী? জাত কী? তা নিয়ে সমাজের মানুষের মধ্যে অনেক সংশয় আছে। তুমি কী এর সত্যটা জানাতে পারবে? অবশ্যই পারবো। সকল মানুষের যে ধর্ম 'মনুষত্ব' তাই আমার ধর্ম। সকল ভারতীয়োর যে জাত 'ভারতীয়' তাই আমার জাত। কারণ আমি অনাথ হলেও আমি একজন মানুষ এবং একজন ভারতীয়।

এই রাত

মল্লিকা রং
বি.এ. বাংলা অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

রোহিত–এর বাড়ি কলকাতায়। তারা আগে থাকত মেচেদার এক গ্রামের বাড়িতে। বাবার কাজের সূত্রে চলে আসতে হয় কলকাতায়। এখানে এসে পড়াশোনা করছে। এখন কলেজে পড়ে।

একদিন রোহিতের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। তখন রোহিতের বয়স ৮ কিংবা ৯ হবে। গ্রামের বাড়িতে কত মজা করত তারা, মামাত ভাই, বোন, মামা, মামি, দাদু, মাসি এবং পাসের বাড়ির বন্ধুরা। কত খেলা, সবাই মিলে বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি বিশেষত বাড়ীর পিছনে একটা বড় প্রাচীন বট গাছেই খেলত বেশি। এইসব মনে আসে তার। দাদু কেমন আছে? তার বন্ধুরা কেমন আছে? তবে ওরা চলে আসার পর শুনেছিল বড়ো মামাও কাজের সূত্রে দিল্লী চলে গিয়েছে। সেদিন রাতে মাকে বলে যে, ''এখন কিছুদিন কলেজ ছুটি, দাদুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি চলনা''। কিন্তু বাবা শুনে বলল, 'তুই ঘুরে আয়না, দাদুরা কেমন আছে দেখে আয়।'' রোহিত তাতে রাজিও হয়ে গেল।

কিছুদিন পর এল সেই দিন, রোহিত খুশি হয় খুব। মা বাবাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। তখন পড়ন্ত সূর্য ডুবে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। ট্রেনে চড়ে যাবে সে। স্টেশনে আসার কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িও পেয়ে গেল। গাড়িতে বসে বসে ভাবতে থাকে দাদুর কথা। দাদুর কতটা বয়স হয়েছে, সেই প্রাচীন বটগাছ এখনো আছে কিনা, তার বন্ধুরা কি চিনতে পারবে তাকে এইসব ভাবতে ভাবতে বেশ কয়েকটি স্টেশন পেরিয়ে যায়।

তারপর রোহিত বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকে। স্নিগ্ধ সন্ধ্যার কালো অন্ধকারে বাইরে সবকিছু যেন আঁধারে মিশে গেছে। বন–জঙ্গল–রাস্তা–খাল সব যেন দুরন্ত হয়ে ছুটে চলেছে। তার অন্ধকারময় অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে চলে এসেছে অনেক দূরে। ট্রেন থামতে দেখে আর দুটি মাত্র স্টেশন বাকি। ইতিমধ্যে গাড়ীর ভীড় কমে গেছে, কয়েকজন মাত্র আছে গাড়ির মধ্যে বেশ রাত হয়ে গেছে বোধ হয়, মনে মনে ভাবতে থাকে।

গাড়ির মধ্যে ঘোষণা করল মেচেদা স্টেশনে আসছে। ট্রেন ধীরে ধীরে স্টেশনে

প্রবেশ করল। রোহিত নেমে আসে ট্রেন থেকে। বাবা ঠিকানা বলে দিয়েছিল, সেইমত স্টেশন ছেড়ে এগোতে থাকে দাদুর বাড়ি ''শশধর ভবনের'' দিকে।

যাবার পথে দেখা হয় তার বাল্যবন্ধু সৌমিত্র–এর সঙ্গে। অনেকদিন পর দেখা হলে যা হয়। গল্প করতে করতে দেরী হয়ে যায়। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগোতে থাকে। বাড়িতে গিয়ে ভেবেছিল সবাইকে চমকে দেবে তাই কোনো চিঠি, ফোন কিছুই না করে এসেছে। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। দূর থেকে বাড়ীটা অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কারণ বাড়িটা ছিল তেতলা। এছাড়াও আলো জ্বলছে বাড়ির মধ্যে। এমন সময় সে যেন নিজে থেকেই কেমন ভয়ে কেঁপে ওঠে। তৎক্ষণাৎ দেখে কে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন চেনা লাগছিল। পরমুহূর্তে দেখে আরো দুজন দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের মধ্যে একজন ছিল বয়স্ক। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুলতে সব ছায়া উধাও হয়ে গেল। তবুও ভয়ে ভয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

বাড়িতে ঢুকে দেখে বাড়িতে মামা, মামিরাও এসেছে। এছাড়াও আছে মাসি, মেশো, দাদা, ভাই, বোন সকলেই। রোহিত বাড়িতে ঢোকার পর সবার সাথে সাক্ষাৎ হয়, চিনতেও পারলো সবাইকে। সবাই রোহিতের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করল। এছাড়াও আরো গল্প আড্ডা হল। তার মধ্যে রোহিত জানতে পারে পাশের বাড়ির দাদু মারা গেছে। সেই কথাটা শুনে গা ছমছম করে ওঠে। আর পাশের বাড়ির দুটো পুরোনো বন্ধুও মারা গেছে। একথা শুনে তার আর বুঝতে বাকি থাকে না সে আসার পথে কাদের দেখে এসেছে।

শরীরে পথের ক্লান্তি থাকায় তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উঠে খাবার টেবিলে আবার সবাই একসাথে মিলিত হয়। খাওয়া সেরে সবার সাথে আড্ডা, গল্প করতে করতে কখন যে দুপুর হয়ে যায় তারা বুঝেই উঠতে পারেনি। ইতিমধ্যে তার পুরানো বন্ধুগুলোর সাথে দেখাও করেছে। সবাই মিলে ঠিক হল পুরোনো খেলার জায়গায়, মাঠে ঘুরতে বের হবে বিকালে।

বিকাল হতে না হতেই বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। এর মধ্যে জানতে পারে দাদুর ও দুই বন্ধুর মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক ছিল না। সেই গল্প সন্ধ্যা বেলা শুনবে ঠিক হল। সন্ধ্যা বেলা তারা সবাই ছাদে উঠে গিয়ে বসে আর শুরু হয় দাদু ও দুই বন্ধুর মৃত্যুর কাহিনী।

দাদুর মৃত্যু নাকি একজনকে রেললাইনে দেখে তাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনিই মারা

যান। আর দুই বন্ধুর মধ্যে কমল মামার বাড়ি গিয়েছিল ঘুরতে। কয়েকদিন পর মামার বাড়ি থেকে এসে দাদুর ডাক শুনে বাইরে আসতে গিয়ে কোনোভাবে খালে পড়ে যায়। আর ওর লাস ওই বটগাছের পাশের খালেতে পড়ে ছিল। আর সতীশ মারা যায় একদিন কী কারনে জানি না দুপুরে এই বাড়ীরর তিনতলায় ছুটে যায়। ছাদে যাবার কিছুক্ষণ পর তার গলা শোনা যায়। দাদু বলে চিৎকার করার পর ওপর থেকে কিছু পড়ার শব্দ শোনা যায়। সবাই নীচে এসে দেখে সতীশ ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। সারা শরীর থেতলে গেছে। মাটি যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এই তিনটি ঘটনার পর দুপুরে–রাতে ছায়া দেখলে বা কারোর ডাক শুনলে যেত না।

এইসব শুনতে শুনতে কত রাত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। তবে তার মনে হল যে, আসার সময় তো সেও তিনমূর্তির ছায়া দর্শন করেছে! তবে কী? সে ভাবছে, বলবে, হঠাৎ তাকিয়ে দেখে তার সামনে কেউ নেই, ছাদে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে দরজার সামনে গেল নীচে যাবার জন্যে, এবার খুব ভয় হচ্ছে তার। তারপর পিছন থেকে কে ডাকছে শুনতে পায়, সে ভাবছে যাবে, নাকি যাবে না? কোন দিকে যাবে, নীচে নাকি উপরে? কে ডাকছে বুঝতে পারছে না? ঠিক ভুল উলোট–পালট হয়ে যাচ্ছে। মাথা বন বন করে ঘুরছে। চক্ষু স্থির, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আসার পথে দেখা স ই তিন মূর্তি। তখন ঠিক যেমন চেনা মনে হয়েছিল ঠিক তেমনি। ডাকছে তাকে যাতে বলছে তাদের কাছে, পরমুহূর্তে দাদু বলে চিৎকার করে পড়ে যায় ছাদে।

চিৎকার শুনে ছাদে আসে সবাই। অচেতন অবস্থায় একাকে পড়ে থাকতে দেখে। তারপর ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে দেখে বাড়ির সবাই তাকে ঘিরে বসে আছে। আর সবাই উৎকন্ঠার চোখে তাকিয়ে থাকে। সে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার? ভাই বোনেরা তাকে ঠাট্টার করে বলে, ''তোকে ভূতে পেয়েছে''। হঠাৎই বিদ্যুতের চকিতের মতো সব ঘটনা মনে আসায় আতকে ওঠে, গলা শুকিয়ে যায়। তার এই অবস্থা দেখে সবাই শান্ত করে তাকে জিজ্ঞাসা করে কী ঘটেছিল? সব কথা খুলে বললে রোহিত। তখন সবাই বারণ করে দেয় সন্ধ্যার পর কোথাও না যেতে। তবে তারা বলে সেই তিনজনের পর আর কারো কোনো ঘটনা শোনা যায়নি। কিন্তু হঠাৎই রোহিতের এমন অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যায় সবাই। রোহিতকে বলল যে, সে তবু দাদু বলে চিৎকার করেছিল! নইলে বুঝতেও পারা যেত না। এইসব বলে সবাই তাকে সান্তনা দেয়। কিন্তু সকলের সান্ত্বনার দিকে খেয়ালই নেই রোহিতের। সে ভাবছে শুধু এই রাতের কথা, কী ভয়ংকর এই রাত। তাঁর জীবনে এই ভয়ংকর রাতের কথা ভুলতে পারবে না সে কোনো দিনই।

শুভ জন্মদিন

শুভময় চ্যাটার্জী
ফিলোসফি অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

আজ রাত থেকে মিলির চোখে ঘুম নেই। কাল তার পাঁচ বছর পূর্ণ হবে, সে আনন্দে আজ সাড়া বাড়ি মাথায় করছে। কখনো তার বাপির কাছে গিয়ে বলছে– 'আমাকে কাল কী গিফট্ দেবে?' আবার কখনো মামির কাছে গিয়ে বলছে–'মামি আমার একটা ভালো ড্রেস কিনে দিতেই হবে।' ছোট্ট মেয়েটির এরূপ আচরণ দেখে তার বাপি, মামি বেশ খুশিই হচ্ছেন। কারন তাঁরাও জানেন বয়সের তালে তালে সুন্দর মুহূর্ত কোথাও হারিয়ে যায়। এ সব ভেবে তারাও কিছু বলতে পারছেন না। তাও কোনো ক্রমে তার বাপি বলল–'সোনা এবার ঘুমিয়ে পড় কাল আমরা খুব আনন্দ করবো'।

যে মেয়েকে ঘুম থেকে সকালবেলা ওঠাতে বাপি মামির করুণ অবস্থা হতো আজ সকাল থেকেই তার তন্দ্রা ছুটেছে। রাতের আধো অন্ধকার ভেঙ্গে সকাল হবে। ফুলের মধুর সুবাস, পাখির মধুর গুঞ্জন আর সোনালি রৌদ্র এক সুন্দর মাধুর্য প্রদান করছে, মিলিকে তার মামি ডাকতে এসে অবাক 'কীরে এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিস?' মিলি জানলার দিকে মুখ করে সকালের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করছিল। মামির দিকে তাকিয়ে বলল–'গুড মর্নিং মামি।'

প্রত্যহ জবরদস্তি করে ঘুম থেকে উঠে, কিছু ব্রেকফাস্ট করেই স্কুল যাবার জন্য তৈরী হওয়া, এই হল রোজকার রুটিং। কিন্তু আজ মিলি স্কুল না যাবার বায়না করে বসল, 'আজ তো জন্মদিন, আজও স্কুল যেতে হবে? কই আমার বন্ধুরাতো তাদের জন্মদিনের দিন আসে না।' এমনতর যুক্তি খাড়া করে বসল। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটির বাপি, মামি তাকে স্কুলে পাঠাবার শত চেষ্টা করতে লাগল। 'সোনা', 'বাবু', 'বাছা' করে কত কথা বোঝাতে লাগলেন তারা। অবশেষে একটা সারপ্রাইজ দেবার বাহানাতে এক প্রকার জবরদস্তি করেই স্কুলে পাঠানো গেল। পিক্ পিক্ করে স্কুলের বাসের হর্ন বাজতেই মিলির বাপি মিলিকে আদর করে বাসে তুলে দিলেন। প্রত্যেক দিনের মতো তার বাপি 'ভালো করে পড়াশুনো করবে, কারোর সাথে মারপিট করবে না' ইত্যাদি বলতে বাকি রাখলেন না, আর প্রত্যেকদিনের মতো মিলিও 'টাটা' বলে বাসটি স্কুলের দিকে রওনা দিল। মিলি বেশ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করলে মিষ্টি করে হেসে

সুন্দরভাবে বলতে সে পারদর্শী। 'তোমার বয়স কত?' কেউ এমন প্রশ্ন করলে মিলি গাঁট গুনে গুনে উত্তর দেয় 'আমার বয়স চার বছর, এগারো মাস, তিন দিন।

আজ সন্ধ্যাবেলায় এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, মিলির পাঁচ বছরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণও করা হয়েছে। মিলির বাপি একদৃষ্টে মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজে কোনো এক খবর পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। মিলির বাপি ফোনটা রিসিভ করেন-'হ্যালো ওপাস থেকে স্পষ্ট কন্ঠস্বর ভেসে এলো-''আপনি কি মিলি রায়ের বাড়ি থেকে কথা বলছেন।

– হ্যাঁ আমি ওর বাপি বলছি।

–আমি পটাশপুর থানার ও.সি. বলছি। আপনার মেয়ের স্কুলের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা দাঁড়িয়ে থাকা বাসকে ধাক্কা মারে ওদের সবাইকে আমরা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছি আপনি এখুনি আসুন।

কথাগুলো শুনে মোবাইল ফোনটা হাত থেকে পড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে তড়িঘড়ি করে মিলির বাপি, মামি ছুটলেন জেলা হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের প্রায় হুমড়ি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন-'আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিন। আজ জন্মদিন ওর।'

ডাক্তারবাবু জবাবে বললেন-'আমায় ক্ষমা করবেন। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আপনার মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ, আপনাকে চাইলে ওকে দেখতে পারেন, তবে ভিতরে ঢুকবেন না।

একটা কাঁচের দরজার ঘরের ভিতর তার মামি, বাপির আদরের ছোট্ট দুষ্টু মিষ্টি মিলি নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। যে মেয়েটি কয়েক ঘন্টা আগে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, মেয়েটির মামি, বাপি এসব দেখে আর নিশ্চুপ থাকতে পারল না। তারা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। আর মিলির চোখ দিয়ে সারা জীবনের চোখের জল বেরিয়ে গেল। পৃথিবী থেকে সে চিরকালের মতো বিদায় নিলো।

হারানো সুর

বিদিশা চক্রবর্ত্তী

বি.এস.সি. জেনারেল (চতুর্থ সেমেস্টার)

কলকাতার একটি ছোট পরিবারের একমাত্র মেয়ে মিনি, মিনতি চৌধুরী। বাবা পেশায় কলেজের প্রফেসর, মা ডাক্তার, ঠাকুমা বৃদ্ধ, এদের সকলকে নিয়ে মিনির ছোট্ট পরিবার। বাবা–মা এত কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের স্নেহ থেকে মিনি কখনও বঞ্চিত হয়নি। পরিবারের সকলের আদরের মিনির পারদর্শীতার কথা বললে একটি তালিকা ছাড়িয়ে যাবে। বাড়ি ভর্তি পর্যাপ্ত পরিমানে চাকর থাকা সত্ত্বেও নিজের কাজ সে কাউকে করতে দেয় না এমনকি ঠাকুমাকেও নানা কাজে সাহায্য করত। ঠাকুমাকে বাগানো হাঁটানো, পুজোর জোগাড়, পুঁথিপাঠ, সেলাই–বোনাই এইসব কাজে মিনি ঠাকুমাকে সাহায্য করত। এছাড়া ছোট্ট মিষ্টি মিনি পড়াশোনাতে যেমন ভাল ছিল তেমনই গলায় ছিল অদ্ভুত সুর। ছোট থেকেই গানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও গলায় সুর দেখেই তার বাবা–মা তাকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেয়। এটা অবশ্য তার ঠাকুমার প্রেরনাতেই হয়। খুব শীঘ্রই মিনির গানের প্রচার সারা স্কুল, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়–স্বজন এমনকি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। গানের নানা অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতায় সে অসংখ্য পুরস্কার, সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করে। মিনি যখন ১৫বছরের তখন সে অনেক রেকর্ডিং–এ গান গেয়েছে। তারর বাড়ির একটা বড়ো ঘরে তো তার পুরস্কারের অসংখ্য ভান্ডার বিরাজ করত। ঠাকুমার আদরের মিনি আজ নামকরা গায়িকা 'মিনতি চৌধুরি'। যখন তার ১৮ বছর বয়স সে তার ঠাকুমাকে হারায় ও মিনতির জীবনে দুঃখের শেষ থাকে না। কিন্তু তার গান, নাম–খ্যাতি ইত্যাদি তাকে গানের জগতে আবার ব্যস্ত করে দেয়। মিনতির গানের সিডি, ক্যাসেট ইত্যাদি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। বাবা–মার গর্ব মিনতির এই সুখী জীবনে হঠাৎ একদিন ঘটে যায় এক বড় দুর্ঘটনা। একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে নতুন গাড়ি পুরস্কার স্বরূপ পায় মিনতি। তখন সবেমাত্র সে গাড়ি চালাতে শিখেছে, তাই আগ্রহ সহকারে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সারা শহর জুড়ে ওঠে হাহাকার, দুঃখের ঝড়, মিনতির মা বাবা ও ঠাকুমার আদরের মিনি নিজের সুর হারিয়েছে, দুর্ঘটনাবশত সে আর কোনো দিনও কথা বলবেনা ও গানও গাইবেনা। এই খবরে মিনতি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। ভগবান তার সুর কেড়ে নিয়ে তাকে চিরজীবনের দুঃখ দিয়েছেন। নিজেদের একমাত্র সন্তানের এরূপ অবস্থা দেখেও মিনতির বাবা মা নিজেদের মিনিকে সান্ত্বনা দিত, তাকে কখনও ভেঙে পড়তে দিত না, তাকে বুকে আগলে রেখে তার দুঃখ যন্ত্রনা ভোলানোর চেষ্টা করতেন। মিনতি আবার ছোট মিনির মতো বাবা–মা–এর কাছে ঝরঝর করে কাঁদত আর সারাদিন ঠাকুমার ঘরে একাকী বসে থাকাত। মাঝে মধ্যে মিনি তার বীনা, সেতার, হারমনিয়াম ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্রগুলির সাথে সময় কাটাত। কিন্তু তার বাজনায় সেই অপূর্ব তাল উঠত না, বাজনার মূর্ছনা খেলত না। জানালার ধারে বসে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মিনি খুঁজে বেড়াতো তার, 'হারানো সুর'।

Anushree Naskar
B.A. (General) 4th Semester

Anushree Naskar
B.A. (General) 4th Semester

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার দৃষ্টিভঙ্গি

শুভদীপ ঘোষ
বাংলা অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

''হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে''–বাংলা সাহিত্য, যা হাজার বছর ধরে আমাদের মধ্যে তার আধিপত্য স্থাপন করে চলেছে। আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তাই বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে আমার এই পথ চলা মাত্র একবছরের। তবে এই এক বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে সর্বব্যাপী বিকাশ–তার সম্বন্ধে অনেকটাই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। কীভাবে বাংলা সাহিত্য মানব মনে সঞ্চারিত হয়, তা আপন অন্তরের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে শিখেছি। বাংলা অনার্সের সঙ্গে মিলনের পূর্বে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তা কথঞ্চিৎ। কিন্তু এখন বুঝি বাংলা সাহিত্য আসলে একটা সমুদ্রের মতো। আসলে সাহিত্য বাঁধা–বন্ধনহীন, এর কোনো বিনাশ নেই। বাংলা ভাষার বিকাশ কোথাও কোথাও আভার ট্র্যাজেডির হাহাকার, আবার কোথাও বা ট্র্যাজেডি ও প্রেমের মিলন–এইসবের সমন্বয়ই সাহিত্য। তবে একবছর বাংলা অনার্স পড়ে আমি যা সবথেকে বেশি অধ্যয়ণ করতে পেরেছি তা হল সাহিত্যের সরসতা–যা আমায় সাহিত্যের প্রতি আরও দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু বাংলা অনার্স তথা বাংলা সাহিত্য নিয়ে পথ চলা কতটা কঠিন বিষয়, তা আমি একবছর আগে বুঝতে না পারলেও এখন আমি সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যের কাঠিন্য সম্পর্কে বুঝতে শিখেছি। তবে প্রলয় ঝড়ে আটকে পড়া একটি ক্ষুদ্র ডিঙির পালের ন্যায় অসহায়ত্ব বোধ করিনি। বরং ঝড়ের প্রবল দাপটে সেই প্রলয় ভেদ করে উদ্দাম গতিতে অগ্রবর্তী হওয়ার প্রতি অধিক পরিমানে আগ্রহী ছিলাম। উপন্যাস, গল্প, নাটক, কাব্য, কবিতা–এই সবই লেখক ও কবিমনের বহিঃপ্রকাশ। জলপ্রপাতের জলরাশির যেমন কোনো অন্ত থাকে না, তেমনই সাহিত্যেরও কোনো অন্ত নেই। বাংলা সাহিত্য নিয়ে একবছর পড়ার অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টিভঙ্গি বলতে তা শুধুমাত্র জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা হল অজানাকে জানা, নতুনের আহ্বান, অপরূপের স্বরূপ সন্ধান প্রভৃতি প্রসঙ্গ। তাই সাহিত্য কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত নয়, সাহিত্য হল সৃষ্টি, সাহিত্য হল বিকাশ, আর তার চেয়েও বড় কথা ভালোলাগা ও ভালোবাসা–সাহিত্য সেই ভালোলাগারই অন্যতম

মাধ্যম। একবছর বাংলা অনার্স পড়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যকে দেখে তাদের এই অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমি অজ্ঞাত হলেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আমি যা দেখতে পেয়েছি তা হল "Realism" অর্থাৎ বাস্তবতা– যাকে আশ্রয় করে আমাদের প্রত্যহ জীবনযাপন সম্পন্ন হয়, তেমনি বাস্তবতা বাংলা নাটক, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। কোথাও শাসক শ্রেণির অত্যাচারে পীড়িত মানুষ আবার কোথাও বা সেইসব দলিতপিষ্ট মানুষদের উত্থানের কাহিনি এমনভাবে এক ভাবপরিমন্ডল রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে বাস্তবায়িত। সাহিত্য সম্পর্কে আমার ঠিক এমনই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। ''সাহিত্য মানবজীবনের প্রথম সহায়, কারন তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হইতে ছিনিয়ে জাগরূক করে তোলা....''–'সবুজপত্র' পত্রিকায় উল্লেখিত এই সম্পাদকীয় বক্তব্যকে আমি যথার্থ সত্য বলে মনে করি। কারণ সাহিত্য হল এমন এক মাধ্যম, যা আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, বন্ধ্যাত্ব, নিষ্ফলতাবোধ থেকে মুক্ত করে উদার প্রশস্ত পথের মধ্যে অবতারণ করে। তবে সাহিত্য কোনো নিবিড় মেঘ ভরা আকাশের বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার বিষয় নয়, বরং সেই নিবিড় মেঘের গমন ঘটিয়ে উজ্জ্বল আকাশের নীচে অবস্থান করাই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। বাংলার বিস্তৃত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে অঙ্গীকার করে জীবনে পথ চলার স্বপ্ন দেখেছি, আশা করি এই স্বপ্ন আশাতীতভাবে পরিতৃপ্ত হবে। ভাষার উদ্দাম বেগ ও অনর্গলতা আমায় বাংলা সাহিত্যের প্রতি খুব বেশি পরিমানে আকৃষ্ট করে। সুতরাং পরিশেষে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, শুধুমাত্র আমি একথাই বলবো যে সাহিত্য আমার পথ চলার সঙ্গী হওয়ার সাথে সাথে আমার ধর্মও হয়ে উঠেছে। আর এই ধর্মকেই অঙ্গীকার করে নিজের রক্তে সাহিত্যের প্রবাহকে বইয়ে দিতে সক্ষম হতে চাই।

Due to the glamour of the film industry the theatre world is now on the way to gloom.

Tathagata Chowdhury
B.Sc. (G) 1st Year

Twenty first century is the age of science and modernisation as well as technological revolution. This era is also known as the age of glamour, everyone is in a race and competing with each other to make themselves more and more magnificent to others.

God has made this wonderful world to sustain life. In this life besides all other necessities, entertainnment or the recreation plays a crucial role to replenish or to refresh ones mind and if one is mentally fresh then he / she can led a healthy life.

In a primitive times man chose the way to play different outdoor games with each other as a mode of recreation and entertainment and as the time progressed theatre came in the field of entertainment and people chose at as their mode of refreshment.

Besides entertaining, refreshing and enthralling the people theatre also played a crucial role in revolutioning the culture annd literature. Different great personalities whose contribution in the field of art and literature is inevitable from William Shakespeare to Rabindranath Tagore theatre was their first and foremost choice to commminicate with people.

As the science developed around twenty first century the glamour of film industry secceeded in shaking the roots of theatre from the people's mind and on the way to groom.

Due to the glamorous gesture, in the thirst of limelight and quick recognnition and fame people are choosing the path of films rather than theatre. Over here the econoic conditions also played an important role in glooming the theatre one can earn more and more money in producing or acting in the films or being a part of it in any prospects beside earning fame, but the path of theatre is more difficult in aspects of money and fame but in one aspect theatre is always ahead films industry and will remain in future is the profound acting delivered by the actors of theatre industry which the present personalities of film industry cannot. Theatre is a great media to give a message to the society as well as to the country.

From the beginning of the 19th century the introduction of movie as also a part of media to give message to the society turn into a great competitor of theatre annd gradually the glamour of this celluloid world starts to dominate over the mind of the people gradually erasing out the centiment and attraction of the people towards theatre.

জীবনের প্রকৃত অর্থ

সপ্তরী রায়
শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

জীবনটা বড়ই অদ্ভুত। কখনও এমন ঘটনা ঘটে যে মানুষ কখনও খুব হাসে আবার কখনও কাঁদে। কখনও খুব মন খারাপ হয় আবার কখনও অকারনে খুব উদাসী হয়ে ওঠে। আমাদের জীবনে হয়তো কিছুটা জটিলতা আছে। কিন্তু আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত আমি যা কিছু চেয়েছি সবই পেয়েছি। আমি বর্তমানে হয়তো সব থেকে সুখী মানুষ। কিন্তু তাও মাঝে মাঝে মনটা অস্থির লাগে। বুঝতে পারি না এর কারণ। কিন্তু পরে আমি অনুভব করলাম যে আমি জীবনের প্রকৃত মানে বা অর্থটাই এখনও পরিস্কার করে উপলব্ধি করতে পারিনি।

আসলে আমরা প্রত্যেকেই কমবেশি আবেগে ভেসে চলেছি। কিন্তু বেশি আবেগে ভাসলে তো হবে না তাহলেই মুশকিল। তাই বেশি কল্পনার জগতে না থেকে বাস্তবকে উপলব্ধি করতে হবে। অনেক পরিবার বা পরিজনরা অনেক সময় বলে যে এই ১৪–২০ বছর বয়সকালে সবাই কল্পনায় ভাসে আর অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যারা এইসময় নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই নিজেদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি অবশ্য এখনকারই মেয়ে। কিন্তু আমি এতদিনে এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি যে জীবনটা শুধু ঝগড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা আর রঙিন স্বপ্ন দেখা নয়। জীবনটা শুধু ফোন, হেডফোন আর কম্পিউটার নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকার জন্য নয়। জীবনের একটা অনেক বড় উদ্দেশ্য আছে, একটা বড় অর্থ আছে, এইসব ছোটোখাটো সমস্যা, ঝগড়া, আর ছোট ছোট চিন্তাভাবনায় জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত নষ্ট করলে হবে না। আমার মনে হয় জীবনটা একটা ফিল্মের মতো। তাই ফিল্মে যেমন সঠিকভাবে অভিনয় করতে হয় তেমনি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনেও অভিনয় করতে হয়। তবে সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হয়। অনেকেভাবে জীবন তো একটাই তাই আনন্দ, মজা করে জীবন কাটাব। সবাই তো তাই চায়। আমিও চাই। কিন্তু এই আনন্দের সাথে সাথে এটা ভুললে চলবে না যে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে বাবা মা এবং সমাজের সকলের জন্য। তাই আগে জীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। জীবনে আনন্দ মজা করার সাথে সাথে নিজের লক্ষ্য ঠিক রেখে এগিয়ে চলতে হবে।

শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য নয় সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদেরও কিছু সাহায্য যাতে করতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যে কাজেই যুক্ত থাকিনা কেন তার মূল কেন্দ্রটাই হল মানুষের কল্যাণ এবং মানুষের সুবিধা। তাই জীবনের প্রকৃত অর্থ হল বিনা স্বার্থে সবদিকের দায়িত্ব, পরিবারের দায়িত্ব পালন করেও সমাজের অন্যান্য মানুষের জন্য কিছু দায়িত্ব পালন করা। এমন অনেক মানুষ আছে যারা মানুষের সুযোগসুবিধার জন্য অন্যায় পথে উপায় করে। যেমন–একটা চোর একটা আর্থিক অবস্থাসপন্ন মানুষের বাড়ি থেকে চুরি করে পরে তা নিয়ে কিছু গরীব মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। কিন্তু এটায় মানুষের উপকার হয় ঠিকই কিন্তু এটা সঠিক পথ নয় সমাজের মানুষের উপকার করার। সঠিক পথ হল সেটাই যেটা সৎপথে রোজগার করে করা যায়। তাই আমাদের আবেগ দিয়ে না ভেবে বাস্তবতা দিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের মত বয়সী ছেলেমেয়েরা এখন যারা ফেসবুক, ইন্টারনেটের বিভিন্ন জিনিস দেখে, গেম খেলে অবসর কাটানোয় অভ্যস্ত তাদের যতটা সম্ভব এগুলো কম করে এই সময়ে সামাজিক কিছু কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। আর প্রয়োজন হলে এই সমস্ত ইলেকট্রনিক্স জিনিসগুলিকে সামাজিক কাজকর্মের হাতিয়ার বানাতে হবে। এখনও কিছু সংকীর্ণ মানসিকতার মানুষ রয়েছে। তবে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবনটাকে যথার্থ কাজে লাগাতে হবে। তবেই আমাদের দেশ উন্নয়ণশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হবে। সবাই আর্থিক দিক থেকে অবস্থাপন্ন নাই হতে পারুক কিন্তু কেউ না খেয়ে মরবে না।

তাই শেষে এটুকুই বলতে চাই যে আমার বয়সী বা আমার থেকে বড় যারা আছেন সবাই নিজের জীবনকে উপলব্ধি করুন। আর মনে রেখো–তুমি জীবনে যাই করোনা কেন, তাতে অন্য অনেক মানুষের উপকার হবে। তা যে কাজে যারা পারদর্শী তারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। কারণ সকলের সফলতার উপর নির্ভর করছে সমাজের অন্যান্য মানুষের কল্যাণ। তাই শুধু নিজে বেঁচে থাকাটা এবং আনন্দ করা জীবনের অর্থ নয়, জীবনের প্রকৃত অর্থ হল সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের কথা ভাবা। নিজে আনন্দে থাকার সাথে সাথে অন্যান্য মানুষের কল্যাণের কথা ভাবা এবং তাদের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করা। সর্বোপরি নিজের জীবন সুন্দর করে তোলার সাথে সাথে অন্যান্য মানুষের মঙ্গলসাধন ও তাদেরও জীবন আনন্দে ভরিয়ে তোলা।

"নিজের জন্য বাঁচা জীবন নয়, সকলকে নিয়ে
এবং সকলের জন্য বেঁচে থাকাই হল জীবন।"

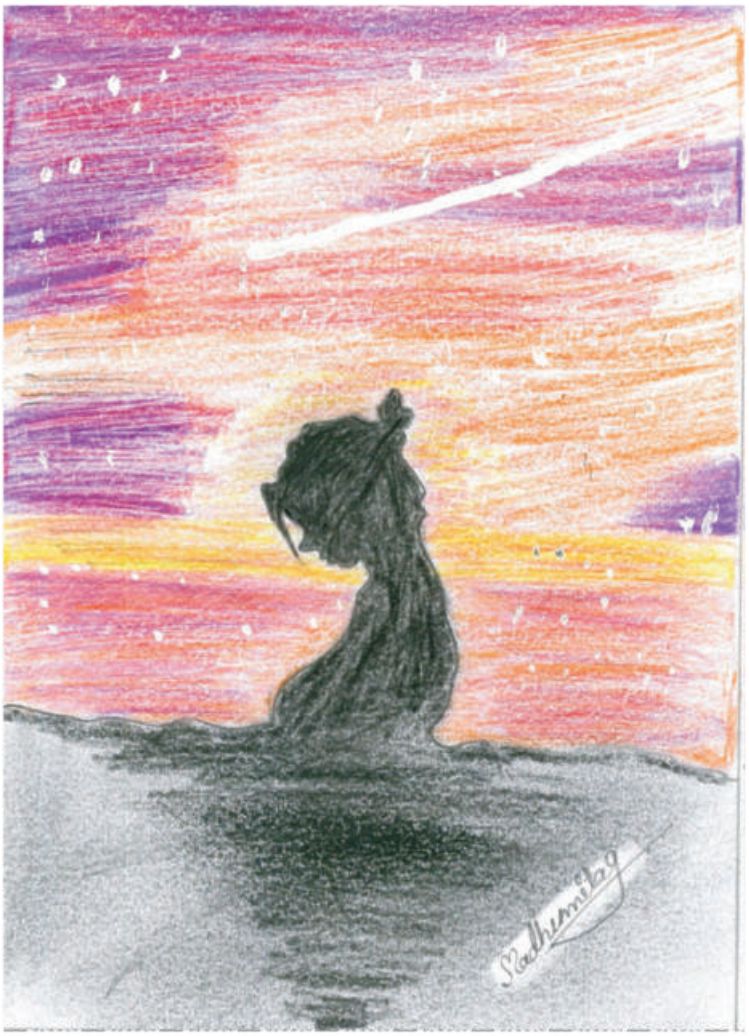

মধুমিতা গায়েন

শ্রেণী ঃ প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

শিক্ষাবিজ্ঞান

ঘাটশিলা ভ্রমণ

স্বর্ণালী করাতি
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাঙালীর মনে ভ্রমণের নেশা চিরকালিন। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার একটা আগ্রহ। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার নামে এক ধরনের রোমাঞ্চ কাজ করে। প্রাচীন ভারতে যাযাবর জাতির মতো আমাদেরও মন চায় দূরে আরও দূরে, দূর থেকে সুদূরে ঘুরে বেড়াতে। দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি জীবন থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি পেতে ! কারও হয়তো পাহাড়, কারও সমুদ্র আবর কারোর হয়তো ঘন সবুজ বনানীকে ভালো লাগে।

আমি ভালোবাসি পাহাড়। পাহাড়ের এমন অপরূপসজ্জা যে না দেখেছে তার পাহাড় প্রীতি আসবে না। একদিন হঠাৎ করে শুনতে পেলাম ঘাটশিলা যাবো ! আমি তো আনন্দে নেচে উঠলাম। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। আমি, মা আর বাবা যাবো। বের হবো খুব ভোরে। তাই আগে থেকেই প্যাকিং শুরু করলাম। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, তখন আমাদের পাঠ্য বইতে ঘাটশিলার উল্লেখ ছিলো। তখন থেকেই ঘাটশিলার স্বপ্ন দেখতাম। তাই বাবার মুখে ঘাটশিলা যাবার নাম শুনেই খুব খুশি হলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা রওনা দিলাম। সকাল ৬টায় ট্রেন। হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি বলা হয়েছে। ভোরে উঠেই আমরা পাড়ি দিলাম। শীতের সময়, বাইরে বেড়াতে যায় অনেকেই। তাই হাওড়া স্টেশনে প্রচুর মানুষের জনসমাগম। আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে বাইশ নং প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। নিজের মনের মধ্যে একটা আলাদা রকম রোমাঞ্চ কাজ করছে। আমি জানালার ধারে বসলাম, যাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সহজেই উপভোগ করতে পারি। ট্রেনটি যখন ঝাড়খন্ড রাজ্যে প্রবেশ করলো তখন মাটির রং পরিবর্তন করে লাল হয়ে গেছে। উঁচু নীচু টিলা, মাঠের পর মাঠ বন্য গাছ, মাঝে মাঝে বালি ভরা মাঠ। খুব সুন্দর দৃশ্য। প্রকৃতির এক অসাধারণ সৃষ্টি। সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে যেন এক অসাধারণত্ব ফুটে উঠছে।

দুপুর ১২.৩০টায় ঘাটশিলা স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে গাড়ি করে হোটেলে। এবার উঁচু নীচু রাস্তা আদিবাসী এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এখানে হিন্দি ও আদিবাসী ভাষা প্রচলিত। বাংলাভাষা খুবই কম লোকজানে। আমি হিন্দিজানি তাই বুঝতে ও বলতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

দুপুরে খাওয়া ও স্নান সেরে বিশ্রাম নিয়ে আমরা সুবর্ণরেখা নদী পরিদর্শনে বেরোলাম। পাহাড়ি জায়গা, বড়ো বড়ো নানান রং-এর পাথর। চালু নদী, নদীর জল

এতটাই স্বচ্ছ যে জলের নীচে শিলাগুলি দেখা যাচ্ছে। কিছুটা দূরেই পাহাড়, তার পাশ দিয়েই নদীটা ধাবমান। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমরা সবাই হোটেলে চলে এলাম। পাহাড়ি এলাকায় রাতে চলাফেরা না করাটাই শ্রেয়– হোটেলের ম্যানেজার বললেন। তাই আর রাতে কোথাও বেরোনো হলনা। বিশ্রাম নেওয়া হলো।

পরের দিন ভোরবেলা ঘুমটা ভাঙলো হোটেলের পাশেই একটা আদিবাসী এলাকা, সেখান থেকে ভেসে আসছে বাহারিগান। যেটা ভোরের পরিবেশটা আরও সুমধুর করেছে পাখির কলকাকলিরর সাথে। সেইগান শোনার জন্য আমি হোটেলের বারান্দায় এলাম। হালকা আলোয় চারিপাশটা দেখা যাচ্ছিল। হালকা কুয়াশা, উঁছু, নীচু বাঁধানো রাস্তা আর সেই রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িগুলি সারিবদ্ধভাবে চলেছে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে। তার সাথে গরুগুলির গলায় দোলানো ঘন্টা ধ্বনি সাঁওতালি গানের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে যেন! সব মিলিয়ে একটা রোমান্টিক পরিবেশ। মনটা আনন্দে ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সবাই ঘুম থেকে উঠলো। আমাদের কাছে সকালের খাবার হিসাবে এল ইডলি আর ধোসা। খাওয়া সেরে আমরা প্রথমে গেলাম ফুলডুঙ্গরি টিলা দেখতে, প্রায় ১০০ ফুটের মতো উঁচু। খাড়া ঢালু রাস্তা ছোটো ছোটো শিলাপূর্ণ চারপাশে বড়ো বড়ো গাছ। ওপরে নানান রং–এর প্রজাপতি একটা মায়াচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে রয়েছি। আমার মনও প্রজাপতির পাখায় ভর করে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। ওখান থেকে আমরা গেলাম সুবর্ণরেখা ব্যারেজে। ব্যারেজের একপাশে নদীর জলপূর্ণ আর অন্যপাশে প্রায় জল নেই বললেই চলে। কিছু দূরে পাহাড়গুলো সারি সারিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

এরপর আমরা উঁচু–নীচু রাস্তা দিয়ে বজরঙ্গবলীর মন্দিরের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। মন্দিরে নানান ধরনের মূর্তি আর কারুকার্যে ভরা। পাশ দিয়ে ৫০ফুট নীচে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সরু পাথরে পূর্ণ পাহাড়ি রাস্তা চারপাশে পাহাড়ী জঙ্গল, ওই রাস্তা দিয়েই আমরা ধীরে ধীরে উঠলাম ভাদুবোরা পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড়ি পথটা ছিল খুবই পিছিল আর বন্যগাছে পূর্ণ। মাঝে মাঝে বড়ো শিলা, পাহাড়ের চূড়ায় বজরঙ্গবলীর একটা সুন্দর পাথরের মূর্তি। আর ওখান থেকে চারিপাশে কুয়াশাচ্ছন্ন চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছিলো। নীচের রাস্তাটি প্রায় দেখাই যাচ্ছিলো না। এই পাহাড়ি ঢালু রাস্তা দিয়ে পুনরায় নীচে নেমে এলাম। ওখান থেকে আমরা সরাসরি স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনের পাশেই ধাবায় দুপুরের খাওয়া সারলাম। অনেকটা সময় স্টেশনে অপেক্ষা করার পর হাওড়াগামী ট্রেন আসলো এবং সন্ধ্যার সময় সেই ট্রেন হাওড়া পৌঁছালো। বাড়ি আসতে ইচ্ছে করছিলোনা। কিন্তু কী করি আসতে তো হবেই। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ফজরুল হক
ভূগোল অনার্স (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

ভূমিকা ঃ

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে সবকিছুই করি। কিন্তু ভ্রমন করিনা। ভ্রমন বলতে রাস্তার মধ্যে দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত পথ অতিক্রম করা নয়। ভ্রমন হল জীবনের দুঃখকে ভুলিয়ে আনন্দ উপভোগ করা। শুধু তাই নয় অভিজ্ঞতার সঞ্চর হয়। এমন করলে আমাদের জীবনের একঘেয়েমি দূর হয়ে যাওয়া, তাই বলি.....

"নতুন জায়গা দেখলে আনন্দ হয় মন
তাই ঘাটশিলায় করলাম আমি ভ্রমন"....

ভ্রমনের অভিজ্ঞতা ঃ

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখ আমার ভ্রমনের প্রথম দিন। ট্রেনের মধ্যে থেকে বসে মনে হচ্ছিল যেন আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। তারপর যখন আমি ঘাটশিলা স্টেশনে পৌঁছালাম ঠিক তখনই অনেক সুন্দর পরিবেশ আমার মনকে মুগ্ধ করে তোলে। প্রথমেই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলামনা যে ঝাড়খন্ডের ঘাটশিলা শহরটি এত সুন্দর যা মানুষের মনকে বদলে দিতে পারে। তারপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল ছোটো ছোটো ভেড়ার দল তার সঙ্গে অনেক মানুষ। যেন নিজের গ্রামের থেকেও বেশি সুন্দর। তারপর কিছুটা এগিয়ে একটি একটি করে দোকান পেরিয়ে 'সানন্দা হোটেলে পৌঁছালাম। তারপর বিকাল তিনটের সময় আমি সার্ভের জন্য আদিবাসী এলাকায় যাওয়ার সময় চারিদিকে সবুজ বন পেরিয়ে পৌঁছালাম। সার্ভে করতে গিয়ে সেখানের ঘরবাড়ি গাছপালা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। প্রতিটি বাড়ি সবুজ বনের ভিত্তরে মাটির কুঁড়ে ঘর, তার দেওয়ালের চারিদিকে কতনা কারুকার্য করা, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কল্পনার জগৎ। এখানে জনসংখ্যা খুবই কম। শিক্ষার হার নেই বললেই চলে। বাচ্ছাদের দেখে মনে হল কেন এরা বিদ্যালয়ে পড়তে পারছেনা। কারন তাদের ছোটোবেলা থেকে কাজের পথ দেখিয়ে দেওয়া হত। এই সবকিছুর পর আবার কুড়ি মিনিট পথ অতিক্রম করে দেখলাম। অনেক উঁচু জায়গার মধ্যে একটি মন্দির। মন্দিরটির নাম রাঙ্কিনী দেবীর মন্দির। প্রচুর লোক এখানে পূজা দেয়। তখন আমি

দাঁড়িয়েছিলাম। আর মন্দিরের চারিপাশে শুধু নারকেল ঝোলানো, নারকেলগুলি বিভিন্ন মানুষ ঝুলিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল। এখানে প্রায় তিরিশ মিনিট পর আবার বাসে চেপে চল্লিশ মিনিট পথ অতিক্রম করে পৌঁছালাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়–এর বাড়িতে। সেখানে সেই সময় তালা দেওয়া ছিল। কিন্তু আমি অনেক অনুরোধ করে বলতে আমাকে বাড়িটির ভিতরে ঢোকালেন। বাড়িতে ঢুকে প্রথম চোখে পড়ল তার পোশাক, সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি। আবার চোখে পড়ল তার বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালি'। মনে হচ্ছিল যেন আমরা হয়তো স্বপ্ন দেখছি কিন্তু আমি ওই মুহূর্তে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি। তবুও নিজে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আবার বাসে চেপে দশ মিনিট পথ অতিক্রম করে পৌঁছালাম রামকৃষ্ণ মঠ। ওখানে মা–বাবাদের সমবয়সী মানুষের উপস্থিতি। সকলের মধ্যে খুবই মিলন। সকলে মিলে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পড়ছিলেন। কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল মা–সারদা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্তি। আর চারিদিক শুধু লাল নীল ফুলে ভরা। রামকৃষ্ণ মঠে গরীব ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য ঔষধ দান করা হচ্ছিল। সব দেখে মনে হচ্ছিল আমার গ্রামের লোকেরা যদি এত সুবিধা পেত তাহলে খুবই ভালো হতো। পাঁচ মিনিট পর আবার বিভূতিভূষণ লাইব্রেরী কিন্তু সেখানে ঢুকতে পারলাম না। বাসে চেপে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। রাত্রে খুবই আরামদায়ক আবহাওয়া। রাত্রি বারোটা তখন খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর চোখ বোজানোর পর সকাল হয়ে গেল।

ভ্রমনের দ্বিতীয় দিন ঃ

বেলা দশটার সময় একটা বাস ভাড়া করে আমি প্রতিটি জিনিস তুলে নিলাম। প্রায় আধ ঘন্টা পথ পেরিয়ে চললে গেলাম 'বুরুধি বাঁধ'। বাঁধটি খুবই বড়ো। সেখানে প্রচুর জোরে শব্দ করে স্রোত বেয়ে চলেছে। স্রোতগুলি দেখে খুবই আনন্দ পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল জলের মধ্যে যেন যুদ্ধ চলছে। খুবই সুন্দর বাঁধের স্রোতগুলি। সেই মুহূর্তে অনেক জেলেরা মাছ সংগ্রহ করছিল। সব দেখার পর আবার পনেরো মিনিট পর পৌঁছালাম কালাডিহী বাঁধ। বাঁধটির চারিদিকে বড়ো বড়ো পাথর আর কাশফুলে ভরা। বাঁধটির মধ্যে অনেক বাচ্ছারা সাঁতার কাটছিল। ওদের মনে কোনো ভয় নেই। এইসব দেখার পর আবার বাসে চেপে প্রায় আধঘন্টা পর চলে গেলাম রাতমোহনা ব্রিজ সেখান থেকে দেখতে পেলাম সেই সোনার নদী সুবর্ণরেখা নদী। নদীর চারিপাশে সোনায় ভরা আর জলের ঢেউয়ের মধ্যে যেন সোনা ভাসছে। ইচ্ছে করছিল যেন ওই সোনাগুলি

আমরা তুলে নিই। কিন্তু তুলতে পারলাম না। প্রায় এক ঘন্টা পর আবার বাসে চেপে চলে গেলাম বুরুদী হ্রদ। হ্রদটি খুবই সুন্দর, চারিদিকে মাটির রং লাল। হ্রদটির মধ্যে গতিবেগ সম্পন্ন নৌকার ব্যবস্থার ছিল। আমি নৌকার মধ্যে উঠে হ্রদটির মধ্যে চালাতে লাগলাম। বসে থেকে পাহাড়ের মাথাগুলি দেখে মনে হচ্ছিল পাহাড়টি আমার কাছাকাছি চলে আসছে। চারিদিক শুধুই মানুষের ভিড়। আমি কিছুক্ষণ পর নৌকা থেকে নেমে সেই লাল লাল মাটিগুলি কিছুটা ভেঙ্গে তুলে নিলাম। আবার বাসে চেপে একটি জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলাম। বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে যেন নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ছে না। শুধুমাত্র জঙ্গলের চারিপাশের এলাকা দেখতে থাকলাম। পরে দেখতে পেলাম আবার ছোট ছোট ভেড়া। হাঁটতে হাঁটতে একটি জায়গায় বসে পড়লাম। পাঁচ মিনিট পর আবার উঠে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে উঁচু জায়গা আবার নীচু জায়গা পেরিয়ে পৌঁছালাম ধারাগিহী স্রোতের কাছে। উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে প্রবল বেগে ঝরনা পড়ছিল। তা দেখে আমার মন মুগ্ধ হয়ে ওঠে। পাহাড়ের কাছে অনেক ছোটো বড়ো পাথরের মাঝে মাঝে জল জমা হয়ে আছে। সেই জলগুলির মধ্যে হাত দিয়ে ছবি তুলতে থাকলাম। পাহাড়ের কিছু উপরে একটি তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তেঁতুল কুড়োলাম। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে আমি ভুগোল বিষয়ের বিভিন্ন শিলা দেখে অনেকগুলি ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলাম। তখন বাজে সন্ধ্যা পাঁচটা। ধীরে ধীরে আবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে এলাম। বাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বাসে উঠে হোটেলে দিকে চলললাম। সন্ধ্যা যখন আটটা বাজে তখন নাচ, গানের অনুষ্ঠান–এর মধ্যে হাজির হলাম। সেখানের নাচগুলি খুবই সুন্দর লাগছিল। আবার রাত্রি এগারোটার পর খাবার–দাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর ভোর হয়ে গেল। তৃতীয় দিনের শুরু।

তৃতীয় দিন ঃ

ভোর তখন চারটে বাজে। ভোরের আবহাওয়া খুবই সুন্দর লাগছিল। আকাশটা সাদা ও কালো মেঘে ঢাকা। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সূর্য উঠে পড়ল। চারিদিক তখনও কুয়াশায় ঢাকা। এইভাবে থাকতে থাকতে বেলা ৯টার সময় ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনের কাছে পৌঁছলাম। বেলা এগারোটায় ট্রেনে উঠে পড়লাম তারপরই আমরা ঘাটশিলা ভ্রমন শেষ করে বাড়ির দিকে রহনা হলাম।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Dr. Kanailal Bhattacharyya College Study Centre (Centre Code : E-09)

Netaji Subhas Open University was established as a State Open University in 1997 by an Act. of West Bengal State Legislature. The act was subsequently amended to empower the University to spred its wings beyond the State. The University is recognnized by Universiy Grants Commission (U.G.C.) & Distance Education Council (D.E.C.) NSOU is the first Mega University in Eastern India. The University offers both conventional as well as skill-specific and job-oriented courses.

Dr. Kanailal Bhattacharyya College Study Centre is one of 161 study centres of N.S.O.U. It has been functioning since June, 2003. The approved courses for our study centre are :-

Programme	Courses	Eligibility Fees	Duration	Admission Session
Post Graduate course (P.G.)	1. M.A. in Bengali, English, English Language Teaching, Po. Sc., Social Work, Public Administration, History Education. 2. M.Com.	3 years Graduate of any discipline	2 years	Session in July of Every Year
	3. M.Sc. (Mathematics)	3 years Graduage (Sc.)	2 years	
	4. MLIS	BLIS	1 year	
Bachelor Degree Programme (B.D.P.)	1. B.A. (Hons.) in Bengali, English, Pol. Sc., History, Education, 2. B. Com. (Hons)	10+2	3year	July of Every year
	3. B.Sc. (Hons.) in Geography, Zoology	10+2 (Sc.)		
Certificate Course	1. Human Rights	10+2	6 months	
	PG Diploma in Journalism & Mass Communication	Graduate	1 sem	
	Bachelor in Library Information Science.	Graduate	1 year	

For Further enquiry students are advised to contact the Co-ordinator during Saturday & Sunday, 2 p.m. to 5 p.m.

NSOU Office	:	2627-2471. (Sat & Sun from 2p.m. to 5 p.m.)
Prof. Keshab Chandra Kham	:	9830696112 (M) Co-ordinator
Sumalay Dey	:	9903068614 (M) Offic e Assistant

Dr. Kanailal Bhattacharya College

Ramrajatala, Santragachi, Howrah-711 104
Post Graduate Study Centre (VU-18)
Affilated to Directorate of Distance Education
Vidyasagar University
Midnapore, West Bengal

Commencement of Admission (Tentativee) 1st Week of August every year.

Sl. No.	Courses	Subject	Eligibility
1.	M.Com	Commerce	B. Com (Hons.) Three year general graduate
2.	M.A.	Bengali, English	Hons./Major/Spl. Hons./Three year General / Post Graduate. Having M.A. in one subject (Other than professional subject) is eligible for Admission into M.A. in any other subject.
3.	M.Sc.	Geography	Hons. in Geography
4.	M.Sc.	Zoology	Hon. in Zoology

For Enquiry :

1. **Dr. Prabin Kumar Sanki**
   Coordinator
   Mobile : 9434805562

2. **Mr. Bhaskar Ghosh**
   Accountant
   Mobile : 9836258367

3. **Mrs. Nabanita Banerjee**
   Office Staff
   Mobile : 9874117467

Dr. Kaustubh Lahibi
Principal
Phone : 2627 2490

আপনারা মহিলাদের প্রথমে শিক্ষিত করুন এবং তাদের নিজের মতো ছেড়ে দিন, তারপরে তারা আপনাকে বলবে যে তাদের জন্য কি কি সংস্কার প্রয়োজন।

-স্বামী বিবেকানন্দ

Bipasha Debnath

2nd Semester (HISA)